সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

মার্চ ২০১৬

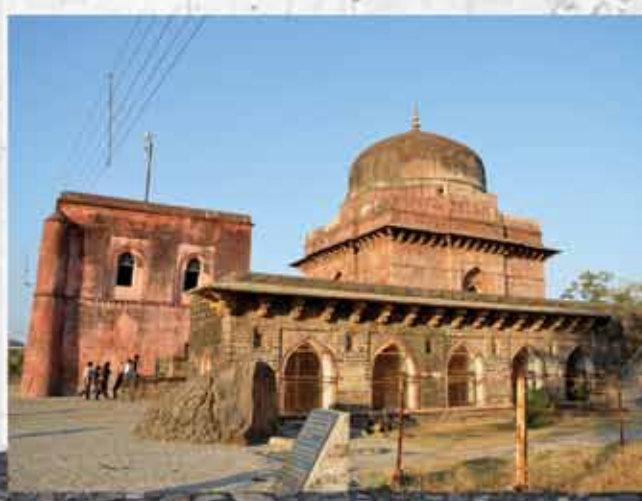

দুর্গনগরী মাণ্ডু

উপরে ॥ ১. ২৭ জানুয়ারি ২০১৬ আইজিসিসি গুলশান কেন্দ্রে ভারতের আসিসিআর ট্রুপের সঞ্জীব এবং অশ্বিনী শংকরের সানাই বাদন ২. ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ আইজিসিসি গুলশান কেন্দ্রে কলকাতার বাচিক শিল্পী রত্না মিত্র ও অমিত রায়ের শ্রুতিনাটক পরিবেশন ৩. ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ আইজিসিসি গুলশান কেন্দ্রে ড. হারুন-অর-রশিদের গজল পরিবেশন

নিচে ॥ ৪. ৫-৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ আইসিসিআর প্রেরিত ভারতের সাবেক হাই কমিশনার শ্রীমতী বীণা সিক্রির নেতৃত্বে পারফরমেন্স অডিট টিম-এর সফর ৫. ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ আইজিসিসি গুলশান কেন্দ্রে স্বপ্নীল সজীবের *রং লাগালে* শীর্ষক রবীন্দ্রসংগীত সন্ধ্যা ৬. ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বসুন্ধরার আইইউবি-মিলনায়তনে অর্ণ কমলিকার *শ্যামা* নৃত্যনাট্যের উদ্বোধন

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ চুয়াল্লিশ | সংখ্যা ০২ | মাঘ-ফাল্গুন ১৪২২ | মার্চ ২০১৬

www.hcidhaka.gov.in
Facebook page: /IndiaInBangladesh; @ihcdhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

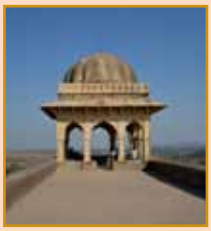

ভ্রমণকাহিনি:
দুর্গনগরী মাণ্ডু
পৃষ্ঠা: ৪২

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ	ঢাকায় উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা বৈঠক ও অন্যান্য	০৪
বিজ্ঞান	স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ সেন্টার ॥ ড. নিশীথকুমার পাল	০৮
ছোটগল্প	সহোদরা ॥ সুদেষ্ণা দাশগুপ্তা	১১
	মন্তাজ গায়েন ॥ খায়রুল আলম সবুজ	৪৫
চলচ্চিত্র	দ্য থার্ড আই ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবের ছবি	১৬
প্রবন্ধ	সীতা ও দ্রৌপদী ॥ ইজাজ হোসেন	১৭
	জরাসন্ধের গল্পের বর্ণময় ভুবন ॥ জ্যোতির্ময় দাশ	৩২
অনুবাদ গল্প	ঐ চোখ দু'টিতে ॥ রাসকিন বন্ড	২১
শ্রদ্ধাঞ্জলি	সুরাইয়া ॥ এমিলি জামান	২৩
কবিতা	নুসরাত নুসিন ॥ অমিতাভ মীর ॥ সোহরাব পাশা ॥ নাসিরুদ্দীন তুসী	২৪
	এস এম তিতুমীর ॥ গোলাম কিবরিয়া পিনু ॥ তুষার কবির ॥ রঞ্জনা রায় ॥ বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়	২৫
ধারাবাহিক	বিগফুট কি সত্যিই আছে? ॥ নাসরীন মুস্তাফা	২৬
	রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা ॥ সালেহা চৌধুরী	৩৮
সৌহার্দ	ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	৩১
ভ্রমণ	দুর্গনগরী মাণ্ডু ॥ অমিতাভ ঘোষ	৪২
শেষ পাতা	নলিনীকান্ত ভট্টশালী ॥ গোলাম আশরাফ খান উজ্জ্বল	৪৮

০৫

ফুলবাড়ি-বাংলাবান্ধা চেকপোস্ট উদ্বোধন

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জেনারেল ভি কে সিং (অব.) ও বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ফুলবাড়ি-বাংলাবান্ধা চেকপোস্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের স্থল সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ হাজার ১ শো কিলোমিটার। এই চেকপোস্টের উদ্বোধনের ফলে বাংলাদেশের রংপুর ও দিনাজপুর এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলীয় জেলা জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং, দিনাজপুর এবং সিকিম ও অসমের জনগণ উপকৃত হবেন। উল্লেখ্য, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মোট ২৮টি স্থলবন্দর দিয়ে লোক চলাচল করে থাকে। দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়ন ও পণ্য চলাচলে এসব বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম।

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩-৭, ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯৮৮২৫৫৫
e-mail: informa@hcidhaka.gov.in
প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স মোঃ রেদওয়ানুর রহমান
মুদ্রণ ডটনেট লিমিটেড
৫১/৫১এ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৬২১৯৮

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

আলোকবর্তিকা

আপনার বহুল প্রচারিত *ভারত বিচিত্রা* শিক্ষা সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, ভৌগোলিক ও সামাজিকভাবে আমাদের ক্লাবের সদস্যসহ এলাকার সাধারণ মানুষের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করে জ্ঞানের আলোতে আলোকিত করে সুন্দর পথের দিশারী করে তুলেছে। আজ আমরা সত্যিই গর্বিত। সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা* আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে মিশে আছে। আমরা এই আলোকবর্তিকা সবার মাঝে বিলিয়ে দিতে চাই।

মুন্সি আফজালুর রহমান
সভাপতি, কুঠিপাড়া পল্লী উন্নয়ন যুব সংঘ
হরিপুর, চাটমোহর, পাবনা

অমৃতসুধা

২০১৪ সালের জুন মাস থেকে অদ্যাবধি সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিত পাঠানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। সত্যি বলতে কি, পত্রিকাটির কারণে পাঠাগারটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, পাঠকেরা *ভারত বিচিত্রা*র অমৃতসুধা পাঠ করার সুযোগ পাচ্ছে, জানতে পারছে অজানা সব বিষয় সম্পর্কে। এজন্য পাঠাগারের সকল সদস্য তথা এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আবারও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এপ্রিল ২০১৫ সংখ্যার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম নতুন গ্রাহক অন্তর্ভুক্তির কাজ চলছে। কিছুদিন আগে পাঠাগারটির রেজিস্ট্রেশন করার সময় ঠিকানায় কিছুটা সংশোধনী এসেছে– সেটি উল্লেখ করা হল। নতুন ঠিকানায় পত্রিকাটি নিয়মিত পাঠিয়ে বাধিত করবেন।

শ্রী শ্রী হরি গুরুচাঁদ মতুয়া মিশন পাঠাগার
গ্রাম ও ডাকঘর: উত্তর সোনাখালী
উপজেলা: মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর

পথিমধ্যে খোয়া গিয়েছে

আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র বিশাল ভারতের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং প্রত্যক্ষ সাহায্যে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এজন্যে ভারত সরকার এবং সে-দেশের জনগণের প্রতি আমরা চির কৃতজ্ঞ। ভারত এবং বাংলাদেশের মৈত্রীর বন্ধন চির অম্লান। দু'দেশের সম্পর্ক বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গভীর এবং মধুর।

কিছুদিন আগে আপনার সম্পাদিত সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা*র একটি সংখ্যা পড়ার সুযোগ পেয়ে মুগ্ধ হই। এতে প্রকাশিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা, স্মরণীয় মনীষীদের জীবনালেখ্য আমার কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছে। কালবিলম্ব না করে *ভারত বিচিত্রা*র নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য আপনাদের কাছে আবেদন করেছিলাম। অতঃপর এই চমৎকার পত্রিকার সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ঘোরাঘুরি করেও আর কোনও সংখ্যা পাইনি। ২০১৫ সংখ্যা আপনাদের প্রেরিত আকর্ষণীয় পত্রিকা অনাকাঙ্ক্ষিত অব্যবস্থাপনায় পথিমধ্যে খোয়া গিয়েছে। আর এদিকে পত্রিকাটি পড়ার দুর্নিবার আকর্ষণ আমাকে অস্থির করে তুলেছে। ভেবেচিন্তে ঠিকানা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এমতাবস্থায়, এখন থেকে নীচের ঠিকানায় প্রিয় পত্রিকা *ভারত বিচিত্রা* প্রেরণের সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

মো. ওয়াজেদ আলী খান
প্রযত্নে মো. আফজাল আলী খান
বাড়ি প্রস্বপন ১০/৩০/এ, দক্ষিণ আলীপুর
ফরিদপুর-৭৮০০

প্রাপ্তির আশায়

দীর্ঘ পাঁচ-ছয় বছর যাবৎ আমি নিয়মিত *ভারত বিচিত্রা* পেতাম। হঠাৎ অজ্ঞাত কারণে প্রায় দু'বছর পত্রিকাটি আর পাই না। পত্রিকাটি এককথায় জ্ঞান ভাণ্ডার– তথ্যবহুল পত্রিকাটির মাধ্যমে আমরা বহু বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করি। অনেক অজানা তথ্য আজও জানার বাকি। তাই *ভারত বিচিত্রা* প্রাপ্তির আশায় রইলাম।

ডা. শিবপদ মণ্ডল
গ্রাম ও পোস্ট: কালিনগর বাজার
দাকোপ, খুলনা

সযত্নে সংরক্ষণ

আমি ও আমার কলেজের সাতান্নজন শিক্ষক-কর্মচারী এবং প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী *ভারত বিচিত্রা*র পাঠক হতে ইচ্ছুক। সত্যিকার অর্থে বিশাল ভারতভূমি সম্পর্কে আমরা খুব

কমই জানি। ভারতের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতিসহ অনেক খ্যাতিমান লেখকের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে চাই। আশা করি আমার কলেজের এই বিপুল তৃষ্ণার্ত পাঠকমণ্ডলীকে *ভারত বিচিত্রা*র মাধ্যমে জ্ঞানাহরণে বঞ্চিত করবেন না। আমাদের পাঠ তৃষ্ণা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে কলেজ লাইব্রেরিতে যাতে পত্রিকাটি সযত্নে সংরক্ষণ করতে পারি সে অপেক্ষায় রইলাম।

আশা করি ভারতের সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধনে অন্যদের সঙ্গে আমাদেরকেও আবদ্ধ করবেন।

অধ্যক্ষ
আবুল হোসেন সরকারি কলেজ
ঠাকুরগাঁও

রুচিশীল পত্রিকা

আমি বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক (ড্রইং)। ছাত্রজীবনে *ভারত বিচিত্রা*র নিয়মিত পাঠক ছিলাম। বাদশা মিয়া রোডে চট্টগ্রাম সরকারি চারুকলা কলেজের ছাত্র থাকাকালে আমার কলেজের সামনেই ছিল ভারতীয় সহকারী হাই কমিশন অফিস। তখন নিয়মিত পত্রিকাটি পড়তাম। এখন চাকরিসূত্রে অনেক দূরে বসবাস করায় নিয়মিত পড়ার সুযোগ পাই না।

আমাদের ঠিকানায় নিয়মিত *ভারত বিচিত্রা* পাঠালে আমরা সবাই এই রুচিশীল পত্রিকাটি পড়ার সুযোগ পাব।

নিরঞ্জন কর্মকার (সহকারী শিক্ষক ড্রইং)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ স্কুল এন্ড কলেজ
বিরাসর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

বাঙালির সবচেয়ে বড় গর্ব যে তার অন্তরতম ব্যক্তিত্ব, বাংলার স্বাধীনতার মহান প্রবক্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মেছিলেন বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামে আজ থেকে ৯৭ বছর আগে, ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হবে। যে নেতার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন, মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলে সেই সম্ভাবনার যবনিকাপাত ঘটেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সার্বভৌম ত্রিকালদর্শী কবির ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায়নি, পুবেব দিগ্বলয় রাঙিয়ে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন দেশের স্বাধীনতা-সূর্য ঠিকই উদ্ভাসিত হয়েছে, যাঁর অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা-ভালবাসায় 'বঙ্গবন্ধু' অভিধায় আখ্যায়িত করেছি। তিনি জাতির জনক।

বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘ। যুগে যুগে আমাদের ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থানের বিরুদ্ধে অন্যরা প্রভুত্ব করতে চেয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেই বঞ্চনা থেকে আমাদের মুক্তি এনে দিয়েছেন। তিনি আমাদের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ নায়ক– আমাদের প্রেরণা এবং অন্তহীন গৌরব।

এক একটি করে দিন বাড়ে আর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তিলে তিলে স্ফীত হতে থাকে। *ভারত বিচিত্রা* চুয়াল্লিশ বছরে পা রেখেছে। বাংলাদেশের সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এটি একটি মাইলফলক। ডানায় রৌদ্রের গন্ধ শুষে নিয়ে *ভারত বিচিত্রা* পক্ষ বিস্তার করেছে সুদূর নীলিমায়, তার পালকে বর্ণালি আলোকবিভা। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় এর আঙ্গিক বিন্যাসে কিছু পরিবর্তন এসেছে, একনিষ্ঠ পাঠক আশা করি তা অনুভব করতে পেরেছেন।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এক কিশোরের *অমৃতবাজার পত্রিকার* এক পুজোবার্ষিকীর মাধ্যমে। সেই পত্রিকায় 'সওদাগর' শিরোনামা এক উপন্যাসে শ্যামলবাবু দু'জন মানুষের গল্প শুনিয়েছিলেন– একজন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর, আরেকজন 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি' নামে একটি মাল্টিলেভেল মার্কেটিং কোম্পানির কর্ণধার। টাকা আছে তাদের দু'জনের কাছেই, কিন্তু তার ব্যবহার আলাদা। শেষে সেই 'খারাপ' টাকার মালিকের হাতে 'ভাল' টাকার তবিলদারকে কিভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, সেই ইতিবৃত্ত পাঠকমনকে ভারাক্রান্ত করে। পরবর্তীকালে শ্যামলবাবুর সঙ্গে সেই কিশোরের পত্রালাপ হয়, অবশ্য ততদিনে সে আর কিশোরটি নেই– তিনি তার অনুরোধে *ভারত বিচিত্রায়* দিয়েছেন 'এক গেরস্তর তিন সংশয়' নামে একটি চমৎকার ধারাবাহিক উপন্যাস, যেখানে কলকাতার পাতালের বিচিত্র কীটপতঙ্গের সুলুকসন্ধান পাওয়া যায়। বোধহয় তখন পাতাল রেলের জন্য খোঁড়াখুঁড়ি চলছিল, শ্যামলবাবুর সৃষ্টিশীল মন সেখান থেকে রসদ পায়। এই কৃতি কথাশিল্পীর জন্ম ১৯৩৩ সালের ২৫ মার্চ।

মার্চ মাসের জাতকদের তালিকায় আরো আছেন বাংলার সাহিত্যের আরও কয়েকজন উজ্জ্বল তারকা। রাজশেখর বসু, জরাসন্ধ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, বিমল মিত্র, প্রতিভা বসু, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত এঁদের অন্যতম। বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার উৎপল দত্তও জন্মেছিলেন এ কালখণ্ডে। বাংলা সাহিত্যে এঁদের অবদান অসামান্য। সবাইকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা।

ঢাকায় উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা বৈঠক

১৯-২০ জানুয়ারি ২০১৬ ঢাকায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ / জলবিদ্যুৎ এবং সংযোগ ও ট্রানজিট নিয়ে বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত ও নেপালের মধ্যে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা বিষয়ে যৌথ কার্যকর গ্রুপের তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (দক্ষিণ এশিয়া) তারেক মো. আরিফুল ইসলাম, ভূটানি প্রতিনিধদলের নেতৃত্ব দেন সে-দেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের জলবিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ সিস্টেম বিভাগের পরিচালক কর্ম পি দর্জি; নেপালি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন সে-দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (দক্ষিণ এশিয়া) প্রকাশ কুমার সুবেদী এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বিদেশ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মিস সুপ্রিয়া রঙ্গনাথন।

ইনভেস্টমেন্ট এন্ড পলিসি সামিটে অংশগ্রহণ

২৪-২৫ জানুয়ারি ২০১৬ ঢাকায় বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট এন্ড পলিসি সামিট ২০১৬-য় মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী ড. মুকুল সাংমা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও বাংলাদেশের মধ্যকার বিদ্যমান অর্থনীতির প্রশংসা করেন। তিনি মেঘালয়ের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গ, ভূটান ও নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের আঞ্চলিক সংযোগ স্থাপন, জলবিদ্যুৎ, বাঁশ, আগর, মশলা ও অন্যান্য অর্থকরী ফসলের সৃজনশীল ব্যবহারসহ কৃষিখাতে টেকসই বিনিয়োগ ও যৌথ সহযোগিতায় আমন্ত্রণ জানান।

আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান শ্রী গৌতম আদানি বিদ্যুৎ, বন্দর ও অন্যান্য অবকাঠামো খাতে ৮শো কোটি ডলার বিনিয়োগ হয়েছে জানিয়ে বলেন, শুধুমাত্র বাংলাদেশে তাদের ১৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্লান্ট স্থাপনে বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি উপকূলীয় জাহাজ চলাচল চুক্তির আওতায় ওড়িশার ধামরা গভীর সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করে বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের প্রস্তাব দেন।

অনুষ্ঠানে অনিল আম্বানি উপস্থিত থাকার কথা ছিল। তাঁর অবর্তমানে আম্বানি গ্রুপের ভাইস-প্রেসিডেন্ট সমীর গুপ্তা বাংলাদেশে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক ৩০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সমন্বিত বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে ৩শো কোটি ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব দেন।

ভারতের ৬৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ঢাকার রেডিসান ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত

ভারতের ৬৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ঢাকার রেডিসান ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এবারের থিম ছিল ভারত সরকারের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত। অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা গত বছরের জুনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরকালে স্বাক্ষরিত ২২টি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়নের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ভারতের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী ও প্রিয়তম বন্ধু।

অনুষ্ঠানে সরকারের বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা, কূটনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী ও ভারতের অনুর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড়সহ খেলোয়াড়বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ভারতের প্রখ্যাত সানাই বাদক সঞ্জীব শঙ্কর ও অশ্বিনী শংকরের সানাইয়ের সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় কর্মকাণ্ডের ভিডিও ক্লিপ অতিথিদের মুগ্ধ করে।

ওইদিন সকালে শ্রী শ্রিংলা বারিধারায় ভারতীয় হাই কমিশনের নতুন চ্যাঞ্চেরি কমপ্লেক্সে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর ভারতের রাষ্ট্রপতির জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণ পাঠ করেন।

প্রধানমন্ত্রী সকাশে ভারতীয় হাই কমিশনার

১৯ জানুয়ারি ২০১৬ আনুষ্ঠানিক পরিচয়পত্র পেশ করার পর বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে হাই কমিশনার বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো সম্প্রসারণ ও জোরদারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তিনি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে 'নতুন প্রজন্ম নই দিশা' শীর্ষক যৌথ ঘোষণার কথা স্মরণ করেন এবং গত বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরকালে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

সাক্ষাৎকালে হাই কমিশনার দুই দেশের মধ্যে সম্প্রতি ও আসন্ন অনুষ্ঠেয় নানা বৈঠকের উল্লেখ করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' খুব শিগগিরই হিন্দিতে অনূদিত হতে যাচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রীকে জানান।

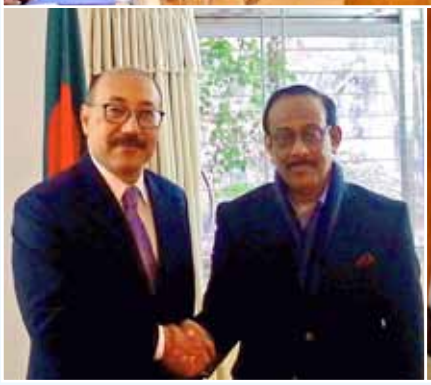

ঘড়ির কাঁটার দিকে– ২৭ জানুয়ারি ২০১৬ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হকের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সৌজন্য সাক্ষাৎ ॥ ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ নতুন দিল্লিতে পররাষ্ট্র সচিব এস জয়শংকরের সঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হকের বৈঠক ॥ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আবুল হাসান মাহমুদ আলীর সঙ্গে শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা সৌজন্য সাক্ষাৎ

জ্বালানিবিষয়ক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক

ভারতের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পারাদ্বীপ অয়েল রিফাইনারি উদ্বোধনের প্রাক্কালে ভুবনেশ্বরে (ওড়িশা) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা ড. তওফিক-ই-ইলাহি চৌধুরী বীর বিক্রম-এর সঙ্গে দিপক্ষীয় আলোচনায় মিলিত হন। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই তেল শোধনাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের প্রাক্কালে তাঁরা বৈঠকে বসেন। ইন্ডিয়ান অয়েলের এই একাদশ তেল শোধনাগারটি ভারতের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণে সাহায্য করবে।

আলাপকালে শ্রী প্রধান বাংলাদেশের জ্বালানি উপদেষ্টাকে জ্বালানিখাতে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা বাড়াতে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতকে কাজ করার অঙ্গীকারের কথা জানান। তিনি বলেন, ভারতের বিভিন্ন তেল কোম্পানি বাংলাদেশে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে। এসব প্রস্তাবের দ্রুত বাস্তবায়ন দুই দেশের জন্য 'উইন-উইন' পরিবেশ সৃষ্টি করবে। তিনি এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, পারাদ্বীপ তেল শোধনাগারের উদ্বোধনের ফলে ভারত বাংলাদেশে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য রফতানি করতে পারবে। তিনি বাংলাদেশে বাজারজাতকরণ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠায় ভারতের আগ্রহের কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে এলপিজি পরিবহনে বাংলাদেশের সহায়তা কামনা করেন। তিনি বলেন, ভারতের সরকারি খাত বাংলাদেশে তেল অনুসন্ধান, শোধনাগার ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী।

ফুলবাড়ি-বাংলাবান্ধা চেকপোস্ট উদ্বোধন

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জেনারেল ভি কে সিং (অব.) ও বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ফুলবাড়ি-বাংলাবান্ধা চেকপোস্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী গৌতম দেব, পশ্চিমবঙ্গের পুরসভা ও নগর উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ফরহাদ হাকিম এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের স্থল সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ হাজার ১ শো কিলোমিটার। এই চেকপোস্টের উদ্বোধনের ফলে বাংলাদেশের রংপুর ও দিনাজপুর এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলীয় জেলা জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং, দিনাজপুর এবং সিকিম ও অসমের জনগণ উপকৃত হবেন। উল্লেখ্য, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মোট ২৮টি স্থলবন্দর দিয়ে

লোক চলাচল করে থাকে। দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়ন ও পণ্য চলাচলে এসব বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঢাকায় ভারতের বিমানবাহিনি প্রধান

ভারতীয় বিমানবাহিনির প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অরূপ রাহা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পাঁচদিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। শ্রী রাহা ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনিসমূহের প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিরও চেয়ারম্যান।

সফরকালে তিনি বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সামরিক বাহিনির প্রধান ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন বিমান ঘাঁটিও পরিদর্শন করেন।

শ্রী রাহা মীরপুরের মিলিটারি ইনস্টিটিউট

অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজির জন্য বিমান সংক্রান্ত কিছু প্রশিক্ষণ সামগ্রী নিয়ে আসেন এবং ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত একটি বিমান উপহার দেন।

২৯ জানুয়ারি ২০১৬ সাউথ এশিয়ান স্পিকার'স সামিট অন এ্যাচিভিং সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস শীর্ষক বৈঠকে যোগ দিতে ভারতের লোকসভার স্পিকার শ্রীমতী সুমিত্রা মহাজন ঢাকায় আসেন। ঢাকায় অবস্থানকালে শ্রীমতী মহাজন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ও অন্যান্য মহিলা সাংসদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে সমঝোতা স্মারক

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে অনুষ্ঠিত ৮ম এশিয়া ফার্মা এক্সপো-য় ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী মহেন্দ্র মেহতা ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা দুই সমিতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, উভয় দেশেই ঔষধশিল্পে উচ্চ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক ও বন্ধনের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে শ্রী শ্রিংলা ঔষধখাতে অধিকতর সহযোগিতায় ভারতীয় হাই কমিশনের সর্বাত্মক সমর্থনের আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে মহেন্দ্র মেহতা, শফিউজ্জামান ও জিপিই এক্সপো প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরেশ ঝুমরুওয়ালাও বক্তব্য রাখেন।

দুই শত কোটি ডলারের ঋণরেখা চুক্তি স্বাক্ষর

২০১৫ সালের জুন মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে অন্যতম ঘোষণা ছিল বাংলাদেশের জন্য দু'শো কোটি ডলারের ঋণরেখা মঞ্জুর। এর প্রেক্ষিতে ঢাকায় ২০১৬ সালের ৯ মার্চ বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হকের উপস্থিতিতে ভারতের এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক যাদবেন্দ্র মাথুর ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিনের মধ্যে ঋণরেখা চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।

দ্বিতীয় ঋণরেখার অধীনে বিদ্যুৎ, রেলপথ, সড়ক, পরিবহন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, জাহাজ চলাচল, স্বাস্থ্য ও কারিগরি শিক্ষাখাতের মত বিভিন্ন সামাজিক ও অবকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে চিহ্নিত হয়েছে। ২০ বছরে পরিশোধযোগ্য (আপৎকালীন সংরক্ষণ অধিকারসহ) সুদের হার বছরে ১%।

৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজের সঙ্গে নতুন দিল্লিতে তাঁর দপ্তরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহরিয়ার আলম

দুশো কোটি ডলারের ঋণরেখাটিই এদেশে এপর্যন্ত ভারতের সবচেয়ে বড় ঋণরেখা। বাংলাদেশকে ভারতের প্রথম একশো কোটি ডলারের ঋণরেখাটি দেওয়া হয়েছিল ২০১০ সালে। এর মধ্যে ২০ কোটি ডলার পরবর্তীকালে মঞ্জুরি সহায়তা হিসেবে রূপান্তরিত হয় এবং ঋণরেখাটি একটি সংশোধনী চুক্তির মাধ্যমে ৮০ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ২০১৫ সালে ৮৬ কোটি ২০ লাখ ডলারে উন্নীত হয়। প্রথম ঋণরেখার ১৫টি প্রকল্পের সবগুলিই ভারতের এক্সিম বাংকের অর্থনৈতিক সহায়তায় পাওয়া গিয়েছিল। মোট ১৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৭টি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, বাকিগুলি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

এই চুক্তি স্বাক্ষর বিভিন্ন চিহ্নিত খাতের প্রকল্পের কাজ শুরু করার পথ করে দিয়েছে। এই চুক্তিতে অবকাঠামোগত প্রকল্প ছাড়াও স্বাস্থ্য (মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন), শিক্ষা (দুটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের আধুনিকায়ন), এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ (৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আধুনিকায়ন)-এর মত সামাজিক খাতে সহযোগিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে দুই দেশের অর্থনীতি আরো সংহত হবে এবং এসব ক্ষেত্রে আমাদের ফলিত সহযোগিতা আরো জোরদার হবে। ভারত সরকার ঋণরেখার অধীন প্রকল্প প্রস্তাবসমূহের দ্রুত অনুমোদন দিতে বদ্ধপরিকর।

নিজ খরচে ভারতে পড়ালেখার দরখাস্ত আহ্বান

প্রতিবছরের মত এবারও ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের নিজ খরচে ভারতে পড়ালেখার জন্য দরখাস্ত আহ্বান করে। উল্লেখ্য, ভারত সরকার প্রতিবছর বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বৃত্তিও দিয়ে থাকেন।

২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ভারতের বিভিন্ন স্বনামধন্য কলেজ ও প্রতিষ্ঠানে নিজ-ব্যয়ে অধ্যয়ন স্কিমে ভারত সরকার মেডিক্যাল/ডেন্টাল/ইঞ্জিনিয়ারিং ও ফার্মাসি পাঠ্যক্রমে ভর্তির জন্য বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করছে– ১. এমবিবিএস, বিডিএস; ২. বি ই/ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং; ৩. বি ফার্মা/ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি।

যোগ্যতা: এসব পাঠ্যক্রমে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে এসএসসি ও এইচএসসি-তে (ভারতের সিবিএসই মানের ১০+২ অনুরূপ) পদার্থ, রসায়ন ও গণিত (বি ই/ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে) অথবা পদার্থ, রসায়ন ও প্রাণিবিদ্যা অর্থাৎ উদ্ভিদ ও জীববিজ্ঞান (এমবিবিএস / বিডিএস / বি ফার্মাসি / ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি-র ক্ষেত্রে) কমপক্ষে ৬০% এবং ইংরেজিতে ৫০% মার্কসহ গড়ে ন্যূনতম ৬০% মার্ক পেতে হবে।

হাই কমিশন অফ ইন্ডিয়া-র ওয়েবসাইটে www.hcidhaka.gov.in-এ আবেদনপত্র এবং বিস্তারিত নির্দেশাবলী দেওয়া আছে।

আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের সত্যায়িত প্রয়োজনীয় সনদ/কাগজপত্রসহ যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্রের ৪টি সেট ভারতীয় হাই কমিশনের শিক্ষা বিভাগ বাড়ি নং-২, সড়ক নং-১৪২, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২-য় ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ মার্চ ২০১৬-র মধ্যে যে কোন কর্মদিবসে (রবিবার-বৃহস্পতিবার) দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টার মধ্যে জমা দিতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে আবেদনপত্র জমা দেয়ার সময় প্রার্থীদের মূল সার্টিফিকেট পরীক্ষণের জন্য জমা দিতে হবে।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্সটেনশন ৩১১ বা ১৪২ অথবা ই-মেইল attedu@hcidhaka.gov.in বা education@hcidhaka.gov.in দরখাস্ত প্রেরণের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ ২০১৬।

• নিজস্ব প্রতিনিধি

ঢাকায় অনূর্ধ্ব ১৯ এবং জাতীয় ক্রিকেটদলের খেলোয়াড়দের সম্মানে ইন্ডিয়া হাউসে আয়োজিত নৈশভোজে হাই কমিশনার

বিজ্ঞান

স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ সেন্টার

ড. নিশীথকুমার পাল

দালানকোঠা ও অন্যান্য স্থাপনা ভেঙে পড়লে ক্ষতিটা শুধু আর্থিক নয়, এর সঙ্গে প্রায়ই প্রচুর প্রাণহানিও ঘটে। এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য ভূমিকম্প অথবা ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকার জন্য। এসব বিষয় বিবেচনা করেই ভারতের চেন্নাইয়ে অবস্থিত স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ সেন্টারের (এসইআরসি) বিজ্ঞানীরা নির্মাণশিল্পের অনেক নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কৌশল উদ্ভাবন করেছেন, যা সারাদেশেই বিভিন্ন দালানকোঠা ও স্থাপনার সুস্থিরতা প্রদান করেছে। প্রকৃতপক্ষে, ওড়িশার উপকূলীয় অঞ্চলে এসইআরসি-র ডিজাইনের ভিত্তিতে বিশেষ এরোডাইনামিকভাবে স্থাপিত সাইক্লোন সেন্টার বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রগুলির রেডক্রস উচ্চকণ্ঠ প্রশংসা করেছে। ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে ওড়িশায় সুপার সাইক্লোনের সময় প্রত্যেকটিতে প্রায় দুই হাজার মানুষের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ২৩টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র প্রায় ৪৫ হাজার লোকের জীবন বাঁচিয়েছিল। কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর অধীনস্থ এসইআরসি-র গবেষণার উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন প্রকার জটিল স্থাপনার, যেমন শেল রুফ, সঞ্চালন লাইন ও মাইক্রোওয়েভ ও অন্যান্য টাওয়ার, জাহাজ এবং সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানের বিভিন্ন স্থাপনার উন্নতমানের অ্যানালাইসিস, ডিজাইন ও নির্মাণকৌশল উদ্ভাবন।

নতুন দিল্লির পার্লামেন্ট লাইব্রেরি ভবনের ছাদও তৈরি করা হয়েছে এসইআরসি-র ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে। এই সেন্টারের বিজ্ঞানীরা সময় ও খরচসাশ্রয়ী কিছু নির্মাণকৌশল ও দ্রব্য উদ্ভাবন করেছেন। এখানে উদ্ভাবিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিফরমড বার, ফিউনিকুলার শেলস, ফাইবার রিইনফোরসড কংক্রিট ম্যানহোলের ঢাকনা, ফেরো সিমেন্ট জলের ট্যাংক, সার্ভিস কোর ইউনিট ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছেন। কম্পিউটারের সাহায্যে বিভিন্ন স্থাপনা ও স্থাপনা অংশের অ্যানালাইসিস, ডিজাইন ও ড্রাফটিং-এর জন্য কতকগুলি সফটওয়্যার প্যাকেজ তৈরি করা হয়েছে।

প্রারম্ভ

১৯৬৫ সালে রুড়কিতে এসইআরসি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে বের হওয়া এসইআরসি-র বার্ষিক প্রতিবেদনের মুখবন্ধে রুড়কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং এসইআরসি-র কার্যকরি পরিষদের সভাপতি শ্রী জি পান্ডে লেখেন, 'দেশে ও বিদেশে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চের ক্ষেত্রে এসইআরসি খুবই দ্রুত গতিতে বিকশিত হচ্ছে...।' এসইআরসি এক বছরের মধ্যেই রুড়কি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ডিজিটাল কম্পিউটার ব্যবহার করে টান্সমিশন লাইন টাওয়ারের বিশ্লেষণ এবং প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষের জন্য ডিজিটাল কম্পিউটার প্রয়োগে স্ট্রাকচারাল অ্যানালাইসিসের ওপর অ্যাডভান্সড কোর্স চালু করে।

১৯৮০ সালে চেন্নাইয়ের আঞ্চলিক সেন্টারটি পূর্ণাঙ্গ একটি জাতীয় ল্যাবরেটরিতে পরিণত হয়। বর্তমান এটি ভারতের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর এক অনন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ইতোমধ্যে এটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিও অর্জন করেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এটি যৌথভাবে বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করছে।

অর্জন

শুরুর প্রথম দু'দশক এসইআরসি বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রী এবং স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন করেছে। কম্পিউটারের সাহায্যে স্থাপনা ও স্থাপনার অংশের অ্যানালাইসিস ও ডিজাইনের ক্ষেত্রে এসইআরসি যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছে এবং সেইসঙ্গে বেশ কিছু কম্পিউটারের সফট ওয়্যার উদ্ভাবন করেছে। এসব সফট্ওয়্যার বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এখানকার কাজের সুযোগ-সুবিধা এবং নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানীদের প্রাগ্রসর জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করে আনবিক শক্তি বিভাগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- শক্তি ক্ষেত্র, প্রতিরক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের গণপূর্ত বিভাগ, সরকারি ও বেসরকারি এবং আরো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত কর্মসূচি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। এরকম কিছু প্রকল্পের কথা নিচে উল্লেখ করা হল:

- সেপ মেমোরি সংকর ধাতুর তৈরি ডিভাইস ব্যবহার করে নিষ্ক্রিয় সিসমিক সাড়া নিয়ন্ত্রণ।
- জেটি এবং ইনটেক স্ট্রাকচারের অবস্থা মূল্যায়ন।
- স্যাটেলাইট লঞ্চের জন্য অ্যাকস্টিক লোডে দালানকোঠার আচরণ সম্পর্কে ব্যবহারিক ও তত্ত্বীয় অনুসন্ধান।
- স্ট্রেট কার্বন স্টিলের পাইপ ও এলবো-র চিড় খেয়ে যাওয়ার আচরণ।
- বায়ুর বৈশিষ্ট্য এবং স্থান-সুনির্দিষ্ট অন্যান্য আবহাওয়াগত উপাত্তের ব্যাপক পরিমাপন।
- অ্যান্টার্কিকার মৈত্রী বিল্ডিংয়ের গঠনগত মূল্যায়ন।
- কম খরচের একটি ৫০০ কিলোওয়াটের আনুভূমিক অক্ষ বায়ু টারবাইন উদ্ভাবন।
- সফটওয়্যার তৈরিসহ লেসড রিইনফোর্সড স্টোরেজ বিল্ডিংয়ের বিশ্লেষণ, ডিজাইন ও মূল্যায়ন।
- মিন্দোলা নদীর ভিতর দিয়ে বসানো গ্যাস পাইপ লাইনের অপারেশনাল নিরাপত্তার অনুসন্ধান।
- প্রাকৃতিক ড্রাফট শীতলীকরণ টাওয়ার, চিমনি এবং উঁচু অট্টালিকার এরোইলাস্টিক মডেলের ওপর উইন্ড টানেল পরীক্ষা।
- জাহাজ ও জাহাজের অংশের অ্যানালাইসিস ও ডিজাইনের জন্য ইন্টারঅ্যাকটিভ সফটওয়্যার তৈরি।
- পামবন রেলওয়ে ব্রিজের নেভিগেশনাল ব্রিজের সুপারস্ট্রাকচারের অ্যানালাইসিস ও ডিজাইন।
- কাঠগুদাম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৭ ও ৮ নম্বর ইউনিটের অবস্থার মূল্যায়ন।

অর্জনের পেছনের ব্যক্তিরা

বিগত পাঁচ দশকে এসইআরসি-র নেতৃত্বে ছিলেন বেশ কয়েকজন দক্ষ পরিচালক। রুড়কির এসইআরসি এবং সেই সঙ্গে মাদ্রাজের রিজিওনাল সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন প্রফেসর জি এস রামস্বামী (১৯৬৫-'৭৬)। তাঁর উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন হল কোল্ড ওয়ার্কড ডিফরমড বার (গ্রিপ বার)– এটি সিমেন্ট কংক্রিটকে অধিকতর শক্তিশালী করে। এই আবিষ্কারের জন্য সিএসআইআর 'এফআইসিসিআই'য়ের ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন পুরস্কার অর্জন করে এবং এই প্রযুক্তির লাইসেন্সিংয়ের জন্য প্রচুর রয়্যালিটি পায়। আনরিইনফোর্সড ফিউনিকুলার ব্রিক সেল রুফের ডিজাইনের একজন আন্তর্জাতিক বিশিষজ্ঞ হিসেবে রামস্বামী প্রিফ্যাব্রিকেটেড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইসড কনস্ট্রাকশনের কাজে নেতৃত্ব দেন। তাঁর সময়েই স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং আত্মপ্রকাশ করে।

পরবর্তী পরিচালক হন ড. এম রামাইয়া (১৯৭৬-'৯০)। তাঁর দীপ্তিমান নেতৃত্বে ও ইউএনডিপি-র সহায়তায় বিশ্বমানের টাওয়ার টেস্টিং এন্ড রিসার্চ ফ্যাসিলিটি (টিটিআরএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর সময়েই মডেল পরীক্ষার জন্য থ্রি-ডাইমেনশনাল ফটো-ইলাস্টিসিটি, ময়রি টেকনিক, লেসার হলোগ্রাফি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তিনি কম খরচে বাড়ি তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বিষয়ে উৎসাহিত করেন। তাঁর সময়ে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কতকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি হল মনো ব্লক প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট রেলওয়ে স্লিপার এবং ফাইবার রিইনফোর্সড কংক্রিটের ম্যানহোলের ঢাকনা।

স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার ও কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ শ্রী এন ভি রামন (১৯৯০-৯৫) হন পরবর্তী পরিচালক। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কম্পিউটারের ব্যবহার যখন প্রাথমিক পর্যায়ে, রামন তখন অ্যানালাইসিস ও ডিজাইন সফটওয়্যার তৈরি করেন। রামন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে স্ট্রাকচারাল ডিজাইনে কম্পিউটারকে পরিচিত ও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে সফটওয়্যার প্যাকেজের লাইসেন্স করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফ্যাটিগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি ও বিশ্বমানের অ্যাটমোস্ফেরিক বাউন্ডারি লেয়ার উইন্ড টানেল স্থাপন সম্পূর্ণ করতে শ্রী রামনের অবদান উল্লেখযোগ্য।

এসইআরসি-র পরের পরিচালক ফাইনিট এলিমেন্ট মডেলিং বিশেষজ্ঞ ড. টি ভি এস আর আপ্পা রাও (১৯৯৫-২০০১) মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার প্রোজেকেটর জন্য কংক্রিট প্রেসার ভেসেলের মডেল ও প্রোটোটাইপ টেস্টিংয়ের ওপর গবেষণা শুরু করেন। ড. আপ্পা রাও জটিল ও বৃহৎ আকারের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানীদের উৎসাহ যোগাতেন এবং এক্সপোর্ট সিস্টেমস এবং আর্টিফিসিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক ও স্টোকাস্টিক ফাইনিট এলিমেন্ট অ্যানালাইসিস ব্যবহার করে ঝুঁকি বিশ্লেষণের কথা বলতেন। তাঁর সময়েই এই সেন্টার আইএসও

নাইনজিরোজিরোওয়ান (ISO 9001) সার্টিফিকেট পায়।

স্ট্রাকচারাল ডাইনামিক্স বিশেষজ্ঞ ও মেশিন ফাউন্ডেশন ডিজাইন টেস্টিংয়ের অন্যতম বিশেষজ্ঞ বর্তমান পরিচালক (২০০১ থেকে) ড. এন লক্ষ্মণ অনেক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উচ্চমানের গবেষক। তাঁর নেতৃত্বে ভারতে প্রথম একদল বিজ্ঞানী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য টারবো জেনারেটর পেডাস্টালস-এর সম্পূর্ণ ডাইনামিক টেস্টিং করেন। রেলওয়ে ব্রিজের ডাইনামিক টেস্টিংয়ের তিনি ছিলেন কোঅর্ডিনেটর। ড. লক্ষ্মণ প্রতিরক্ষা ও সেনাবাহিনির প্রয়োজনীয় ব্লাস্ট প্রতিরোধ স্থাপনার জন্য লেসড রিইনফোর্সড কংক্রিট কনস্ট্রাকশনের কৌশল উদ্ভাবন করেন। তিনি এরোডাইনামিক আকৃতির ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের ডিজাইন তৈরিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

এই সেন্টার নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছে। ১৯৬৭ সালে কংক্রিট রিইনফোর্সমেন্টের জন্য গ্রিপ বার তৈরি করে পেয়েছে ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন পুরস্কার। কম্পিউটারের সাহায্যে অ্যানালাইসিস ও ডিজাইনের জন্য ১৯৯৯ সালে পেয়েছে সিএসআইআর টেকনোলজি পুরস্কার। উইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় ২০০০ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজির জন্য সিএসআইআর শিল্ড। উইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২০০০ সালের এএসআই আর্য– রুড়কি বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার প্রিভেনশন পুরস্কার এবং ২০০১ সালে আইএসও নাইনজিরোজিরোওয়ান সার্টিফিকেট।

নিশীথকুমার পাল শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

ঘটনাপঞ্জি ❖ মার্চ

কথাশিল্পী শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

০১ মার্চ ১৯৩৪	❖	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
০২ মার্চ ১৯৪৯	❖	সরোজিনী নাইডুর মৃত্যু
০৩ মার্চ ১৮৩৯	❖	শিল্পপতি জামশেদজী টাটার জন্ম
০৫ মার্চ ১৯৩৯	❖	দিব্যেন্দু পালিতের জন্ম
০৮ মার্চ ১৯৪২	❖	আততায়ীর ছুরিকাঘাতে সোমেন চন্দর মৃত্যু
০৯ মার্চ ১৯৮০	❖	কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের মৃত্যু
১২ মার্চ ১৯৮৮	❖	সমরেশ বসুর মৃত্যু
১৩ মার্চ ১৯১৫	❖	প্রতিভা বসুর জন্ম
১৫ মার্চ ১৯০৪	❖	অন্নদাশঙ্কর রায়ের জন্ম
১৬ মার্চ ১৮৮০	❖	রাজশেখর বসুর জন্ম
১৮ মার্চ ১৯১২	❖	বিমল মিত্রের জন্ম
১৮ মার্চ ১৯৭৪	❖	বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যু
২৩ মার্চ ১৯৯৫	❖	শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু
২৩ মার্চ ১৯০২	❖	জরাসন্ধ (চারুচন্দ্র চক্রবর্তী)-র জন্ম
২৫ মার্চ ১৯৩৩	❖	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম
২৯ মার্চ ১৯২৯	❖	উৎপল দত্তের জন্ম
২৯ মার্চ ১৯২৬	❖	স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তর মৃত্যু
৩০ মার্চ ১৬১৫	❖	শাহ্‌জাহান তনয় দারাশিকোহ্‌র জন্ম
৩০ মার্চ ১৮৯৯	❖	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম

ছোটগল্প

সহোদরা

সুদেষ্ণা দাশগুপ্ত

বারবার ঢিলটা ঠিক পাশের ডালটায় গিয়ে লাগছে। বেশ ক'বার মারল বাবলি। এবারের ঢিলটা অনেকক্ষণ তাক করে ধরে রাখল, উফ! সূর্যটা এত চোখে লাগছে। ঠিক মাথার ওপর এখন, আর সময় পেল না মাথায় চড়বার, মনেমনে গজগজ করে বাবলি। লেগেছে! একেবারে মোক্ষম জায়গায় লেগেছে ঢিলটা। টোপা কুল প্রায় আট-দশটা এদিক-ওদিক ঝুপঝাপ পড়তে শুরু করল। ঢিলটা এত জোরে মেরেছে বাবলি যে ওটা সামনের বাগান পার করে বারান্দা ঘেঁষে গিয়ে পড়ল। আর পড়েই ফেটে চৌচির। বারান্দার রোদে বসে স্নানের পর চুল খুলে কোনও বই পড়ছিল রুমকি। ভাঙা ঢিলের দু-এক টুকরো ওর গায়ে এসে লাগল। বই বন্ধ করে রেগেমেগে তেড়ে এল সে। বাবলির কাছে গিয়ে এক ধাক্কা মেরে ওকে মাটিতে ফেলে দিল।

বাবলি ঝুঁকে ফ্রকের কোঁচড়ে কুলগুলো কুড়োচ্ছিল। আবার সব পড়ে যায়। হতভম্ব হয়ে বাবলিও চেঁচিয়ে ওঠে।

– কি হচ্ছে কি দিদি ...। আমি কিন্তু মাকে বলে দেব।

– কি হচ্ছে না? কি হচ্ছে? পাজি মেয়ে এত বড় হয়েছিস ফ্রক তুলে কুল কুড়োচ্ছিস! বারোটা বেজে গেছে চান করিসনি– তুই মাকে বলবি কি... চল আমি মাকে বলছি।

ক্ষেপে গিয়ে বাবলিও রুমকিকে মারতে যায় আর সজোরে নিজের গালে একটা চড় খায়। সেও রুমকির চুলগুলো খানিক চেপে ধরে, কিন্তু পাঁচ বছরের বড় দিদির সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে ওঠে না। এবার রুমকি বাবলির হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারে আর বাবলিও 'আঁক' করে ককিয়ে ওঠে। রুমকি হাত ছেড়ে দিয়ে বলে

–ন্যাকামি করছিস কেন হ্যাঁ? চল মার কাছে চল! এরপরই বাবলি কেঁদে ফেলে।

খুব ছোটোতে বাবলির ধারণা ছিল যে রুমকি মায়ের সুয়োমেয়ে আর সে দুয়োমেয়ে। রুমকি দেখতে ভাল, লম্বা চুল, ক্লাসে ফার্স্ট হয়, ভাল গান গায়। কত গুণ দিদির। তবে বাবলি জানে দিদি খুব হিংসুটে।

রিক্সা করে বাবলি যখন মার সাথে হসপিটাল থেকে ফিরল, প্রায় তিনটে বাজে। দুপুরে খাওয়া হয়নি– পেট চোঁচোঁ করছে খিদেয়। হাতের হাড় সরে গেছিল, সেট করে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়েছে।

এত লিকলিকে চেহারা, রুমকি হাত ধরে টান দিয়েছে একটু আর ডিসলোকেশন হয়ে গেছে। হবে না? ভাত খাবার নাম নেই শুধু পেয়ারা, কুল, চিপস এসব খেয়ে থাকলে এমনই হয়।

পাশের বাড়ির সন্ধ্যামাসি বারান্দা থেকে দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করায় শ্রাবণী জবাব দেন।

মা আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে– দরজা খুলতে আসা রুমকির দিকে একবারও না তাকিয়ে বাবলি বলে। শ্রাবণী উত্তর দেন না। সুশোভন লাঞ্চ-ব্রেকে এসে শুনেছেন ছোটমেয়ের হাতের কথা। খাওয়া-দাওয়া সেরে অপেক্ষা করছিলেন। এখনও বেরোননি। রুমকির চোখ-মুখ দেখে বাবলির এমন মনে হল না যে বাবা ওকে বকেছেন।

কি হাত ভেঙে বসলে? পরীক্ষাটা ভাগ্যিস হল, নয়তো কি করতে? ডান হাতটাই তো।

বলে বাবা হাতটা যেই মাথায় রেখেছে বাবলির, তার গলায় কান্না এসে গেছিল, কিন্তু দিদিকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে আবার কান্না গিলে ফেলে। বাবা সন্ধ্যায় ফিরতে দেরি হবে জানিয়ে স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে যায়। বাবলি একটা কমিক্স নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। বড়দিনের ছুটিতে পরীক্ষার পর সামনের গুহ কাকুদের লনে রোজ সন্ধ্যেয় ব্যাডমিন্টন খেলা হয়। সব বন্ধ হয়ে গেল।

বাবলি ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে রুমকি খাটে ওর কাছে এসে বসে। পুরো ডান হাত জুড়ে প্লাস্টার করা, বোনের যে এত জোরে লাগবে সেটা ও বুঝতে পারেনি। ল্যাকপ্যাকে সিং আর কাকে বলে! পর মুহূর্তে রুমকি আয়নার সামনে চিরুনি দিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের চুল দেখতে লাগল। লম্বা ঘন চুল রুমকির। বাবলির চুল এখনও ছোট। সে মভ-রঙা নেইলপলিশটা নিয়ে বসল, তারপরই ঘড়ির দিকে চোখ পড়ায় ধড়মড় করে উঠে প্রায় দৌড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। সওয়া চারটে বেজে গেছে, এক্ষুণি হরি বলে তামিল ছেলেটি কলেজ থেকে ফিরবে। বিআইটি কলেজে পড়ে। কি তাকাতে তাকাতে যায়! মাঝেমাঝে তো রুমকির দিকে তাকিয়ে মুচকি একটা হাসিও হাসে। ভয়ে রুমকির বুক ঢিপঢিপ করে। কেউ দেখে ফেললে রক্ষে নেই। একদিন তো সামনের বাড়ির গুহকাকু তক্ষুণি ওনাদের বাড়ির গেট খুলে বেরিয়েছেন। রুমকি জানে না গুহকাকু কিছু বুঝেছেন কিনা। অবশ্য এতে রুমকির কোন দোষ নেই। তাও কেন যে এত ভয়! ওই যে যাচ্ছে। কি রকম পাজি দেখেছ! বাইকটা রুমকিদের বাড়ির ঠিক সামনে এসে কেমন আস্তে করে দেয়। ইশ, সামনে যদি কোন গাড়ি এসে যায় এই মুহূর্তে, ও তো ঘাড় ঘুরিয়ে আছে রুমকিদের বারান্দায়। চোখাচোখি হতেই আজও মুচকি হাসল পাজিটা। এরপর থেকেই রুমকি জানে যে সে পড়ায় ঠিক মত মন বসাতে পারবে না। চোখের সামনে বই ধরলেই হরির মুখটা ভেসে আসবে। পুরো নাম হরিহরণ নাইয়ার। রোড়াবাঁধের দিকে থাকে, এফ-টাইপে। রুমকিদের বাড়ির দিকে ওর আসার দরকারই নেই, বিআইটি কলেজ তো রোড়াবাঁধের দিক দিয়ে গেলেই সুবিধে। ফেরাও তাই। ছুটির দিনে এমনিই বাড়ির সামনে দিয়ে চক্কর দিয়ে যায়, হেঁটে। হরি আবার পড়াশুনোয় খুব ভাল, এটাই ফাইনাল ইয়ার। রুমকির ক্লাসমেট পল্লবীর দাদাকে তো হরিই গাইড করেছিল বিআইটি এন্ট্রান্সের আগে। পল্লবীর দাদাও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে বিআইটিতে, ফার্স্ট ইয়ারে। রুমকির এবার ক্লাস ইলেভেন, ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল। ওর খুব ইচ্ছে বিআইটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার। ওকে যদি হরি টিউশন পড়াত। আরক্ত মুখে রুমকি ভাবল, তাহলে নির্ঘাত সে ফেল করত!

দু'দিন হল বাবলির জ্বর। বাবলির ধারণা হাত মচকানোর জন্যই তার জ্বর এসেছে। কিন্তু মা সমানে বলে চলেছে অন্য কথা–

– সারাক্ষণ ঐ কাঁচা কাঁচা কুল খা আরো। দিদিকে দেখে শিখতে পারিস না কিছু? দিদিকে কোনদিন সরস্বতী পুজোর আগে কুল খেতে দেখেছিস?

খুব ছোটোতে বাবলির ধারণা ছিল যে রুমকি মায়ের সুয়োমেয়ে আর সে দুয়োমেয়ে। রুমকি দেখতে ভাল, লম্বা চুল, ক্লাসে ফার্স্ট হয়, ভাল গান গায়। কত গুণ দিদির। তবে বাবলি জানে দিদি খুব হিংসুটে। মায়ের ফেভারিট হচ্ছে দিদি। তবে বাবার যে কে ফেভারিট সেটা ঠিক বাবলি বুঝে উঠতে পারেনি এখনও। মা প্রায়ই রুটি বেলতে বেলতে বা রান্নাঘরের কোনও কাজ করতে করতে মুখে মুখে অঙ্ক জিগ্যেস করে। ক্লাস টেস্টের নম্বর দিয়েছে, বাবলি নম্বরটা যেই বলবে তক্ষুণি মা ঠিক জিগ্যেস করবে, 'বল তো কত পার্সেন্ট পেলি?', এই প্রশ্নটাকেই বাবলি সবচাইতে ভয় পায়। ১০০-টা ওপরে না নিচে বসাবে কিছুতেই আর মনে পড়ে না বাবলির। আন্দাজে যা খুশি একটা বলে আর ওমনি শুরু হয় মার বকাবকি আর দিদির সঙ্গে তুলনা। অনেকেই যে দিদিকে বেশ অন্যভাবে দেখে সেটাও বাবলি লক্ষ্য করেছে। বিশেষ করে পাড়ার দু-একজন দাদা। যদিও দিদি তাদের পাত্তা দেয় না। জ্বর হলেই বাবলি *ছোটদের মহাভারত* নিয়ে পড়ে। এটা তার খুব প্রিয় বই। সব শব্দের মানে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না যদিও। 'ঔরস' মানেটা আজই বাবাকে জিগ্যেস করতে হবে।

রেজাল্ট বেরোল আজ। স্কুলের অঙ্কে যে হাইয়েস্ট পেয়েছে তার কাছ থেকে বাবলি কত পার্সেন্ট পেয়েছে সেটা বের করিয়ে নিয়েছে। আজ নিশ্চয়ই বিরিয়ানি আর কষা মাংস নিয়ে আসবে বাবা। দিদি তো ফার্স্ট হবেই জানা কথা। দিদি ফিরে এসেছে আগেই, মার ঘরেই দু'জনে। রুমকি পেয়েছে ৯১% আর বাবলি ৭৩%। মা অবশ্য বকল না আজ বাবলিকে।

– মা তুমি বাবলি কে বোকো না যেন। ও অনেক পেয়েছে। ৭০% এর মুখ আগে কখনও দেখেছে ও? বলেই রুমকি বারান্দার দিকে পা বাড়াল। বাবলি শুনল যে আজ বাবা খাবার আনবে না, সবাই মিলে 'দাওয়াত' নামে যে নতুন রেস্তোরাঁ হয়েছে সেখানে যাওয়া হবে। ক'দিন হল বাবলির হাতের প্লাস্টার কাটা হয়েছে। সে ঠিক করে নিল নীল আর সাদা নতুন সোয়েটারটা, বেলামাসি বানিয়ে দিয়েছেন, সেটা পরবে প্যারালালের সাথে। এদিকে শীতে সন্ধ্যের পর বেরোলে পা খোলা রাখা যায় না, তাই ভাল ফ্রক এখন সব বাক্সবন্দী। বাবলি বারান্দায় যায় দিদিকে জিগ্যেস করতে সে কি পরবে, আর গিয়েই দেখে রাস্তা দিয়ে বাইক চালিয়ে একটা ছেলে যেতে যেতে দিদির দিকে তাকিয়ে হাসল। দিদির মুখটাও যেন একটু হাসি হাসি। বাবলি অবশ্য এখন বেড়াতে যাওয়া নিয়ে উত্তেজিত থাকায় ব্যাপারটা তেমন গুরুত্ব দেয় না। কি মনে হতে বাবলি ঘরে ঢুকে নিজের ড্রেসটা আলমারি থেকে বার করে বিছানার ওপর রাখে। রুমকি ঘরে ঢুকে যেই দেখল যে বাবলির জামা বিছানায় রাখা, ওমনি চেঁচিয়ে বলল

– এমা, তুই প্যারালাল বার করেছিস কেন? আমি প্যারালাল পরব। ও মা দেখ না, আমি তখন থেকে ঠিক করে রেখেছি যে আমি প্যারালাল আর স্কিভি পরব।

– দুজনেই পরো। বাবলি পরলে তোমার না পরার কি আছে?

– না না, ছিঃ, ওই এক ধরনের ড্রেস দু'জনে পরে আমি কিছুতেই যাব না। বাবলি তুই অন্য কিছু পর।

– না মা আমি আগে বার করে রেখেছি, দিদিকে বল অন্য কিছু পরতে।

– আচ্ছা, থাক থাক। বাবলি যাও তুমি ওই সোয়েটারের সাথেই

বাবা নাকি মাথাটা টেবিলে রেখে আর ওঠেনি। সবাই ভেবেছে বেরোবেন বলে হয়তো মাথা নিচু করে জুতো-মোজা ঠিক করছেন। না বাবা আর ওঠেনি। কোম্পানির ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে আসেন।

তোমার পকেট দেওয়া ব্ল্যাক প্যান্টটা পরে নাও।

বাবলি জানে জেদ করা বৃথা। দিদি কিছুতেই শুনবে না। একই জামা তো দু'বোনের কখনও কেনা বা বানানো হয়ই না। এক ধরনের জামা দু'বোনে পরে বেরোবে সেটা রুমকি কখনোই হতে দেয় না। বাবলির অবশ্য এসব নিয়ে মাথা-ব্যাথা নেই। আয়নার সামনে সে দু'মিনিট দাঁড়ায় কিনা সন্দেহ। রুমকি যেতে আসতে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। চুল এদিকে ফেলে একবার দেখবে, ওদিকে ফেলে একবার দেখবে। বাবলির চুল ছোট। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাবলি রেডি। আর তক্ষুণি রুমকি নিজের ড্রেস নিয়ে ঢুকল এই ঘরে।

– বাহ এই তো খুব স্মার্ট লাগছে।

– এই দিদি হারামজাদা মানে কি রে?

– কি? চুপ কর। পাজি কোথাকার!

– বল না!

– বাবলি যা ওঘরে আমি রেডি হব। ওটা একটা গালি। ওসব আমরা উচ্চারণও করি না।

– তুই মানেটা বল না।

– যার মা-বাবার ঠিক নেই। কে বলেছে ওটা?

– সেটা তো হারামি!

– উফ, হিন্দিতে আমরা শুনি ওটা আর জাদাটা হচ্ছে ছেলে। যার বাবা কে, তা কেউ জানে না।

– ওহ, তার মানে বাবা ছাড়া অন্য কারো ঔরসে হয়েছে।

– কি সব বলছিস? যা বেরো এখান থেকে। পড়াশুনোর নাম নেই আর গালাগালির কালেকশন করছে। মাকে ডাকব এবার কিন্তু।

বাবলি বুঝল কোথাও একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, সুড়সুড় করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ইস্কুলেও ওর বন্ধুরা কি সব বলাবলি করে বাবলি বুঝতে পারে না। প্রায় সব বন্ধুই ওর থেকে বড়। ওরা চাপা কিছু আলোচনা করে বাবলি গেলেই হয় চুপ করে যায় নয়তো বলে

– এই তুই এখনও ছোট, বুঝবি না।

মার ঘরে এসে দেখে বিছানায় একটা খুব সুন্দর মেরুণ রঙা সিল্কের শাড়ি আর ম্যাচ করা ব্লাউজ রাখা। মা চুল বাঁধছে। মারও খুব লম্বা বিনুনি হয়। মা খোঁপা করে না, খোঁপা করলেই চুলের ভারে তা খুলে আসে। মা যে কেন সাজে না! শুধু হালকা রঙের সুতির শাড়ি পরে। আজ নিশ্চয়ই দিদি এই সুন্দর শাড়িটা বার করে দিয়ে গেছে মার জন্য। মা টিপও পরে না।

– মা তুমি আজ শাড়ির সাথে ম্যাচ করে টিপ পরবে, দিদির কাছে মেরুণ রঙের টিপ আছে, আমি দেখেছি।

– কোথায় যাচ্ছি যে এত সাজব? যা তো বারান্দায় গিয়ে দেখ তোদের বাবা আসছে কি না।

বাবলি মোটেও মার কথা শুনে বারান্দায় দেখতে যায় না। আরে বাবা যখন আসবে, তখন তো বসার ঘর দিয়েই ঢুকে আসবে। বাবলিদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল শহরটিতে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ছাড়া প্রায় কেউই বাইরের দরজা বন্ধ করে না। কলিং বেলের আওয়াজ শোনা যায় কদাচিৎ। দিদি আর মা দু'জনকেই সুন্দর দেখতে লাগছে। মা টিপ পরেছে। দিদি নিজের লম্বা চুলে পনিটেল করে রেখেছে, বিনুনি বাঁধেনি, তাই মা গজগজ করছে। অবশ্য দিদি যা চাইবে তাই করবে। মা-ই এক-দু'বার বলে চুপ করে যায়।

– কি রে তোদের বাবা এখনও আসছে না, এসে চা খেয়ে বেরোবে বলল তো। ফোন করবি রুমকি একবার? না থাক গে, ফোন করলে আবার রেগে যায়।

বাবলি, রুমকি, আর মা তিনজনেই এবার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। এভাবে সবাই মিলে বেড়াতে যাওয়া কমই হয়। তাই কারোরই আর বিলম্ব ভাল লাগছে না। একটা স্কুটারের আলো মোড়ের কাছটায় দেখা যাচ্ছে।

– ওই মনে হয় আসছে তাই না রে রুমকি?

বাবলি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়– এটা বাবার স্কুটারের আলো নয়।

স্কুটারটা এবাড়ির গেটের সামনেই এসে দাঁড়াল। বাবলি মুখ চেপে তক্ষুণি বলে ওঠে

– এই দিদি, প্রবীরকাকু আসার আর সময় পেল না, দেখ!

– দেখ মা, বাবলিটা কি অসভ্য। প্রবীরকাকু এস। বাবা কোথায় গো? জানো?

– রুমকি ভেতরে আয়, বৌদি শুনুন।

বাবলি দেখল প্রবীরকাকুর মুখটা জানি কেমন হয়ে আছে। প্রবীরকাকু দিদিকে প্রায় জড়িয়ে ধরে আর মাকেও নিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বোকার মত মুখ করে বাবলি ভেতরের ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল।

রুমকি আর মা খাটে বসে। প্রবীরকাকু দাঁড়িয়ে মার ড্রেসিংটেবিলের সামনে। প্রবীরকাকু অনেক কথা বলছেন, শুনতে শুনতে মা ধপ করে খাটে শুয়ে পড়ল। পড়পড় করে মেরুণ রঙা সিল্কের শাড়িটার আঁচলটা নিয়ে ছিঁড়তে শুরু করেছে মা। স্থানুর মত বসে আছে রুমকি। বাবা নাকি মাথাটা টেবিলে রেখে আর ওঠেনি। সবাই ভেবেছে বেরোবেন বলে হয়তো মাথা নিচু করে জুতো-মোজা ঠিক করছেন। না বাবা আর ওঠেনি। কোম্পানির ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে আসেন। স্ট্রোকের সঙ্গেই মারা গেছে বাবা। এরপর একটার পর একটা দৃশ্য রুমকির চোখের সামনে ঘটে যেতে লাগল। কত কত লোক বাড়ি ভর্তি হয়ে আছে। মাকে দেখতে ডাক্তার আর তারপর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বাবা এল। সন্ধ্যামাসি মাকে ধরে নিয়ে গেলেন বাবার কাছে। বাবাকে নিয়ে বেরোনোর সময় হঠাৎ কোথা থেকে বাবলি এসে রুমকির হাতটা চেপে ধরেছে। এতক্ষণ বাবলিকে দেখতে পায়নি তো, কোথায় ছিল ও?

– আমিও যাব।

প্রবীরকাকু বাবলির হাত ধরে আবার ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। বাবলি কেঁদে কেঁদে বলছে যে সেও রুমকিদের সাথে যাবে।

প্রবীরকাকু প্রায় রোজই আসেন। কখনো সকাল-সন্ধ্যে দু'বার করে। অনেকেই আসেন। এসে অনেকক্ষণ বসে থাকেন কেউ কেউ। নানা কথা বলেন। মা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তাদের কথা শোনে। রুমকির মাঝেমাঝে হাঁফ ধরে, এত চারিধারে লোকেদের কথা শুনতে একটুও ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে মা, বোন আর সে আগের মত বসে গল্প করে। বোনের নানা ছেলেমানুষিতে রাগ করে মা বকে উঠুক। ইস্কুলের দারোয়ানের মুখে শোনা খৈনি খাবার নানা গুণের বর্ণনা দেওয়া যে গানটা বাবলি রোজ গাইত, নিজের দু'হাতে খৈনি ডলার বিশেষ ভঙ্গিমা করে, সেটা কি ভুলে গেছে বোন? পঁয়তাল্লিশ, সতের আর এগার বছরের তিনটে বোবা মানুষ কিছুতেই একে অন্যের সামনে থাকতে চায় না যেন। কাছাকাছি হলেও চোখাচোখি পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে তিনজনই। আজ সন্ধ্যেতেও প্রবীরকাকু এসেছেন বাবার অফিস থেকে কিসব কাগজপত্র নিয়ে। প্রবীরকাকু বাবার ডিপার্টমেন্টেই কাজ করেন। বাবার থেকে অনেক ছোট, ব্যাচেলর। মা কত সময় ঠাট্টা করে ঘটকালির কথা বলেছে। কিন্তু প্রবীরকাকু বয়স হয়ে গেছে বলে এড়িয়ে গেছেন। রুমকি ভাবে নিজের পরিবার নেই বলেই হয়তো নিঃস্বার্থভাবে ওদের এত সাহায্য করছেন।

বৌদি শুনুন মন দিয়ে, রুমকি তুইও এখানে বোস। আমাদের

কোম্পানির তো কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে চাকরি দেবার নিয়ম আছে। তাছাড়া দাদা অন ডিউটি মারা গেছেন। সে-সব কোন সমস্যাই নয়, কিন্তু বুঝলি রুমকি, তোর মা যে গ্রাজুয়েশনটা কমপ্লিট করেনি না, বুঝলি তো, তাই চাকরিটা তেমন সুবিধের হবে না রে। রুমকি আর শ্রাবণী দু'জনেই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রবীরের দিকে।

আমি বলছি কি, এখন থাক। বৌদি আপনাকে চাকরি নিতে হবে না। অফারটা হোল্ড করা থাক। রুমকির তো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছে। পাশ করার সাথে সাথে না হয় জয়েন করবে এখানে। জানি ছ-ছটা বছর, কিন্তু আপনাদের খানিক হিসেব করে চললে অসুবিধে হবে না বৌদি। দাদা গোছানো ছিলেন, কোম্পানি থেকেও ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট আমরা ডিম্যান্ড করেছি। আশা করছি কনসিডার করবে। আর কোয়ার্টারও ছাড়তে হবে না। আপনাদের ব্যাপারটা খুব সিমপ্যাথি নিয়েই দেখছে ম্যানেজমেন্ট। দাদা সকলের প্রিয় ছিলেন তো।

রুমকি মার দিকে তাকিয়ে দেখল, প্রবীরকাকুর শেষ কথাটা মা যেন কেমন প্রবীরকাকুর মুখ থেকে শুষে নেবার মত করে নিয়ে শুনছে। টাকা-পয়সার হিসেব রাখতে মাকে কোনদিন দেখেনি রুমকি। মা ঘর-সংসার করতেই ভালবাসে। আই.এ পাশ। বি.এ কমপ্লিট করেনি। কিন্তু অঙ্কে ভাল। নিচু ক্লাশে মা-ই পড়া দেখিয়ে দিত। তবে আলজেবরার অঙ্ক মা সুবিধে করতে পারে না। এরিথমেটিকে খুব ভাল মা, মুখে মুখে উত্তর দিয়ে দেয়। অফিসের নিয়মে কোন ভাল চাকরি মার হবে না, ডিগ্রি না থাকার জন্য। রুমকির হঠাৎই মনে হল তার কাঁধে কি অনেক ভার এসে পড়ল? পড়াশুনো করতে তার ভাল লাগে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার শখ-আহ্লাদও অনেক। সাজগোজ, গানবাজনা, সিনেমা দেখা, সবেতেই তার উৎসাহ। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে তার এমটেক করার ইচ্ছে, তারপর একটা বেশ বড় চাকরি করার ইচ্ছে। তা নয়, এই শহরেরই কারখানায় তাকে চাকরি নিতে হবে? কেমন যেন এক শিরশিরিনি ভয় করে উঠল রুমকির।

পরের দিন সকালে ইস্কুলের সময় হয়ে যেতেও রুমকি দেখল বাবলি তৈরি হচ্ছে না। জিগ্যেস করায় বলল যে শরীর খারাপ লাগছে, ইস্কুল যাবে না। রুমকি লক্ষ্য করল বাবলির মুখটা বেশ ফ্যাকাসে।

শরীর খারাপ লাগছে তো শুয়ে থাক, ঘুরঘুর করছিস কিসের জন্য?

বাবলি উত্তর না দিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ইস্কুল থেকে ফিরে বিকেলে রুমকি-বাবলি দু'জনেই ভাত খায়। আজ রুমকি একা খাচ্ছে। রুমকি দেখল বাবলি বিকেলে বেরোয়নি। অবশ্য বাবা মারা যাবার পর বাবলি খুব একটা খেলতে যায় না। গল্পের বই পড়ে, কোন কোন দিন ওর বন্ধু ডেইজি কিংবা বুবলা এলে গেটের সামনের সিমেন্টের বেদিটায় বসে গল্প করে। রুমকি দেখে বাবলি এসে ডাইনিং টেবলের একটা চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে রইল। মুখটা জানি কেমন। মুখ ধুয়ে রুমকি খবরের কাগজ নিয়ে বসার ঘরে এল, আড়চোখে দেখে বাবলিও এসে দাঁড়িয়েছে।

– এই কি হয়েছে রে তোর? সকাল থেকে দেখছি পেছু পেছু ঘুরঘুর করছিস।

– দিদি তোর কাছে তুলো-ব্যান্ডেজ আছে? অনেকটা–

– কি? তুলো-ব্যান্ডেজ? কেন? জিগ্যেস করেই রুমকি বুঝতে পারল কি হয়েছে।

– কবে থেকে? মাকে বলিসনি?

বাবলি উত্তর দিল না। সত্যি তো মাকেই বা কি বলবে বাবলি। যা হোক করে রান্না করে, আর সারাদিন শুয়ে থাকে মা। ইশ, বোনটা সারাদিন এভাবে আছে? বসছে না, পাছে দাগ লেগে যায় কোথাও। একটা স্টেফ্রি-র প্যাকেট আলমারি থেকে বার করে রুমকি বোনকে দেয়।

– শোন, ইন্সট্রাকশন প্যাকেটে দেওয়া আছে। এরপর থেকে নিজের ব্যবস্থা নিজে বুঝে নিবি।

কথাটার কি মানে বাবলি বুঝল না। সে কি চাকরি করে যে নিজের ব্যাবস্থা বুঝে নেবে। হয়তো দিদি মাকে বলে কেনানোর কথা বলছে। যাক গে, পরে এটা ভাবা যাবে, বাবলি প্যাকেটটা নিয়ে বাথরুমের দিকে এগোল।

দিদির রেজাল্ট বেরোনোর পর থেকেই দিদির আর মার রোজই গণ্ডগোল বাধছে। বাবলিও এখন অনেক কিছু বোঝে। বাবা মারা যাবার পর থেকে তাদের পরিবারে কেউ উপার্জন করে না, বাবার জমানো টাকা আর কোম্পানির থেকে পাওয়া টাকার ইন্টারেস্টে তাদের সংসার চলছে। সেই একই কোয়ার্টারে থাকা, একই ইস্কুলে যাওয়া। কিন্তু বাবলি টের পায় কোথাও একটা সূক্ষ্ম তফাৎ হয়েছে। হৈ হৈ করে সবাই মিলে কোথাও বেড়াতে যাওয়া, রেস্তোরাঁয় খাওয়া, হঠাৎ হঠাৎ অনেক গল্পের বই কেনা, বাবা চলে যাবার পর এসব পুরোপুরি বন্ধ। প্রবীরকাকু অবশ্য মাঝেমাঝে রুমকি আর বাবলির জন্য অনেকরকম খাবার-দাবার কিনে আনেন। প্রবীরকাকুর ব্যাপারটা বাবলি ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। প্রায় রোজ এখানে আসেন। দিদিকে পড়ান। তবে বাবলি দেখেছে যে ওরা খুব গল্প করে, আর প্রায়ই প্রবীরকাকু দিদিকে জড়িয়ে ধরেন। দিদি ভাল রেজাল্ট করতে পারেনি। আইএসসি আর বিআইটি এনট্র্যান্স দুটোই খারাপ হয়েছে। বিআইটিতে দিদি স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে পারবে না, পড়তে গেলে অনেক খরচ। তাই মা বলছে বিএসসি পড়তে কাছাকাছি যে কলেজটা আছে তাতে। দিদি কিছুতেই বিএসসি পড়বে না। বিএসসি পাশ করেও দিদি বাবার অফিসে চাকরি পেতে পারবে । বাবলির বন্ধু বুবলার মা বলেন

– রুমকি তো ওর বাবার চাকরিটা পাবে।

বাবলি ভাবে বাবার চাকরিটা কি করে পাবে দিদি? বাবা তো অনেক উঁচু পোস্টে চাকরি করত। দিদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে হলে মাকে অনেক টাকার ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে ফেলতে হবে। সেটা মা'র ইচ্ছে নয়। সেজন্য রাগ করে দু'দিন ধরে দিদি ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করছে না। এমন কি প্রবীরকাকুও মাকে বারবার বলছেন যে দিদিকে ইঞ্জিনিয়ারিংই যেন পড়তে দেওয়া হয়। বাবলি একদিন মাকে গজগজ করে বলতে শুনেছে

– আমার কি একটা মেয়ে? যে আমি সব পয়সা শুধু বড়মেয়ের পেছনেই খরচ করব? রুমকিকে তো ছোট থেকেই দেখছি শুধু নিজেরটা হলেই হল। এত বড় দিদি হলে কি হবে, বোনের প্রতি একটুও টান নেই।

প্রবীরকাকুই শেষ পর্যন্ত মাকে বুঝিয়ে রাজি করান। দিদি বিআইটি কলেজে ভর্তি হয়ে যায়। তবে এখনও ক্লাস শুরু হয়নি। প্রবীরকাকু সন্ধ্যেয় দিদিকে পড়ান। বসবার ঘরে ওরা বসে। বাবলি তাই মার ঘরে বাবার একটা ছোট টেবিল আছে সেখানে পড়াশুনো করে। দু-একদিন কি কাজে বাবলি হঠাৎ বসবার ঘরে গিয়ে দেখেছে দিদি আর প্রবীরকাকু দেয়ালের দিকের সোফায় বসে সেদিনের খবরের কাগজটা দু'জনে দু'দিক থেকে ধরে পড়ছে। বাবলিকে দেখে দিদি যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করে। বাবলি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাবলির এবার ক্লাস নাইন। লম্বায় দিদিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আর রুমকির চেয়ে ভরা চেহারা বাবলির। তবে চুল লম্বা করেনি বাবলি। ক্লাস এইট অব্দি বাবলি মার কাছে বায়না করত নাচ শেখার জন্য। রবীন্দ্রজয়ন্তী, ইস্কুলের ফাংশানে প্রতিবার নাচলেও আলাদা করে কোন নাচের স্কুলে বাবলি শেখেনি। কাছাকাছির মধ্যে বর্ধন আন্টি নাচ শেখান, কিন্তু ওনার মেয়ে বুইদি দিদির ক্লাসমেট। পড়াশুনোয় দিদির সঙ্গে খুব রেষারেষি, তাই দিদি চায়নি বাবলি ওর মার কাছে নাচ শিখুক। বাবলি ভাবে দিদি যখন চাকরি করবে, তখন আর কি কি করবে। বাবলি আজকাল মন দিয়ে শুধু পড়াশুনো করে। ভাল রেজাল্ট বাবলিকে করতেই হবে। এবার বুইদি ওদের স্কুলের মধ্যে হাইয়েস্ট নাম্বার পেয়েছে আইএসসিতে। ৯৪%। এখনও পর্যন্ত কেউ এই স্কুলে এত ভাল রেজাল্ট করেনি। বাবলির আদর্শ হচ্ছে বুইদি। দিদি আসলে বুইদিকে প্রচণ্ড হিংসে করে।

– কি বাবলি, পড়াশুনো কেমন হচ্ছে? বুঝলেন বৌদি, আপনার দুই মেয়ের মধ্যে কোন মিল নেই। না দেখতে না স্বভাবে। বাবলি তো দিনদিন পালটে যাচ্ছে।

– তোমার পড়ানো হল রুমকিকে?

প্রবীরকাকু কখন ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন বাবলি খেয়ালই করেনি। প্রবীরকাকু বেরিয়ে গেল, গেটের শব্দে বুঝল বাবলি। তারপরই স্কুটার স্টার্ট দেবার আওয়াজ। বাবলিকে পাশের বাড়ির সন্ধ্যামাসি একদিন রাস্তায় একা পেয়ে জিজ্ঞেস করেছেন

– হ্যাঁ রে বাবলি, প্রবীর কি তোদের বাড়ি রোজ আসে? রুমকিকে পড়ায় বুঝি?

বাবলি সন্ধ্যামাসির প্রশ্নের সুরটা ধরতে পারে। কিন্তু কাউকে বাড়ি ফিরে কিছুই বলে না। দিদি এঘরে ঢুকতেই বাবলি বুঝল মা কিছু দিদিকে বলবে। বাবলি টেবিল থেকে নিজের বইখাতা তুলে বসার ঘরে এসে বসল।

বাবা মারা যাবার পর থেকে বোন মার সঙ্গে শোয়। রুমকি অন্য ঘরে একা। এই ব্যবস্থা রুমকির খুব পছন্দ। সে দুটো ঘরের মাঝের দরজাও বন্ধ করে শোয়। এই রাতের সময়টা তার নিজের, একেবারে প্রাইভেট। সে আর থাকবে তার ডায়ারি। কেউ নাক গলাতে আসবে না। অবশ্য রুমকির ব্যাপারে কেউ নাক গলাতে আসেও না। বোন যখন ছোট ছিল তখন এটা-সেটা ছুঁত আর বকা খেত, মার খেত রুমকির কাছে। বাবলিটা হঠাৎই বড় হয়ে গেছে। আর ভীষণ চুপচাপ। দেখতেও বেশ বড়সড় লাগে। রুমকি লক্ষ্য করেছে বাবলির বুক এখনই তার থেকে ভারি। প্রবীরকাকু সেদিন বাবলির দিকে অমন করে তাকিয়ে ছিল বেশ কিছুক্ষণ, তারপরই রুমকি ভাল করে বোনকে আপাদমস্তক খেয়াল করে দেখে।

বাবা ওরকম হুট করে চলে যাওয়ায় সবচেয়ে অসহায় হয়ে পড়েছিল রুমকি। সে তখন বোনের মত ছেলেমানুষ না আবার মার মত স্বামী-বিয়োগের যন্ত্রণাও তার নয়। কিন্তু কি যে এক ফাঁকাফাঁকা ভয়ের অনুভূতি। তার ওপর মনের ভেতর একটা দায়িত্ববোধের চিন্তা। বাড়িতে কেউ রুমকির এই কষ্ট বোঝার অবস্থায়ও ছিল না। মা শোকে মুহ্যমান। আর বোন ছোট। প্রবীরকাকু ঠিক সেই সময় রুমকির সমব্যাথী হয়ে খুব কাছের একজন হয়ে পড়ল। সমস্ত আলোচনা, দুঃখকষ্ট সব প্রবীরকাকুকেই রুমকি বলত। তাছাড়া রুমকি ভাবে প্রবীরকাকু সব ব্যাপারে যেভাবে তাদের সাহায্য করেছেন সেটা কে করে আজকাল। একদিন খুব কান্নাকাটি করছিল রুমকি, প্রবীরকাকু পিঠে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল আর আস্তে আস্তে রুমকির শরীরে-মনে যেন কি এক ভাললাগার প্রলেপ পড়তে শুরু করে, আর একটু পরেই রুমকি খেয়াল করে প্রবীরকাকু তার বুকে হাত রেখেছেন। এরপর থেকে ব্যাপারটা প্রায় রোজকার হয়ে যায়। যেন একটা খেলা। রুমকি বোঝে এসব ভাল নয়। কিন্তু আটকাবার পথ খুঁজে পায় না। প্রবীরকাকুর ওপর যে ওদের পরিবারটি নির্ভর করে আছে। কে পোহাবে নানারকমের ওসব ঝামেলা! মা যে একটুও স্মার্ট নয়। আর রুমকি কলেজ করবে না ওসব দেখবে। ছোট শহরে নানা কানাঘুষো হয়। এমন কি হরিহরণ যে এসব কারণেই আর রুমকিদের বাড়ির সামনে দিয়ে যায় না, তাও জানে রুমকি। মা রোজ রাগারাগি করে। চোখ ভিজে যাচ্ছে রুমকির।

– বাবা তুমি কেন চলে গেলে? হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে রুমকি। মনে হয় মা, বোন আর কি তাকে বিশ্বাস করে না!

কলেজ চালু হয়ে গেছে রুমকির। হরিহরণকে যদিও এখনও দেখেনি কলেজে। তবে ওর জন্যই কি না জানে না রুমকি, তাকে কেউ তেমন র‍্যাগিং করতে এল না। অবশ্য হোস্টেলে বেশি হয় র‍্যাগিং, রুমকি তো বাড়ির থেকেই যাতায়াত করছে। ক'দিন পর সন্ধ্যেয় বাড়ি এসে শুনল যে প্রবীরকাকু এবার বাবলিকে পড়াবেন। রুমকি তো আর পড়ছে না, ওই সময়টা বাবলি পড়বে এবার থেকে।

– না মা, বাবলিকে প্রবীরকাকুর কাছে পড়তে হবে না। ও এমনিই আজকাল ভাল রেজাল্ট করছে তো।

– মানে? প্রবীর নিজে বলেছে, তুই কি সবার গার্জেন হলি?

– দরকার হলে আমি পড়িয়ে দেব মা।

– রুমকি তুই সব কিছুতেই বোনকে দমিয়ে রাখতে চাস কেন, তা কি আমি বুঝি না ভাবিস?

দু'জনের দিকে একবার তাকিয়ে বাবলি এবার বলে ওঠে

– মা আমার কিন্তু এবার খানিকটা গাইডেন্সের দরকার।

রুমকি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়

– বাবলি, যা পারবি না আমি ফিরলে আমায় জিজ্ঞেস করবি।

এবার শ্রাবণী একেবারে গর্জে ওঠেন

– তোকে আমি চিনি না! সেবার প্রবীর পাঁচ-পাঁচটা ক্যাডবেরি বার তোকে দিল তুই একটা ভেঙেও বোনকে দিসনি।

– উফ মা। ওটা একটা বাজি ধরেছিলাম। জিতলে পাঁচটা ক্যাডবেরি খাবার কথাই হয়েছিল, তাই খেয়েছি।

আজ খুব কান্না পাচ্ছে রুমকির। বাবাকে মনে পড়ছে। মা আজকাল সবসময় সে যে 'বড়' সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়। রুমকি তো জানেই, তাই সে চাইছে না যে প্রবীরকাকু বোনকে পড়াক, প্রবীরকাকু বোনের সঙ্গেও যাতে ওই একই কাজ না করতে পারেন। কিন্তু বোন কেমন রুমকিকে আজ বিপাকে ফেলে দিল। রুমকির ধারণা বোন জানে যে সে হরিহরণকে পছন্দ করে, ভীষণ পছন্দ করে।

– তা হলে দিদি ওই হরিহরণ বলে ছেলেটিকে তুই বল আমি ওর কাছে পড়ব।

রুমকি চমকে ওঠে বোনের কথায়

– হরিহরণ? সে তো ইলেভেন-টুয়েলভ থেকে পড়ায়। তোকে কেন পড়াবে বাবলি?

– পড়াতেও পারে, তুই চেষ্টা কর যাতে পড়ায়। তুই আর ও তো এখন এক কলেজেই পড়িস।

রুমকি উত্তর দেয় না। বোনকে এত প্রত্যয় নিয়ে কথা বলতে কখনও শোনেনি। বাবলি কি কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কথাটা বলল? আজ যেন বাবলির পারসোন্যালিটির সামনে সে গুটিয়ে গেল। বোন সব কিছুতে তার থেকে এগিয়ে যাচ্ছে। রুমকি পড়াশুনোয় ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে, আর বোন লাফিয়ে-লাফিয়ে ভাল রেজাল্ট করছে। বাবার মত লম্বা ফর্সা চেহারা হয়েছে বাবলির, বেশ ভাল দেখতে।

পরের দিন কলেজে লাঞ্চের সময় রুমকি হরিহরণকে অনেক কষ্টে ধরল। ছেলেটি রুমকির প্রাণের ধুকপুকুনি। কত রোম্যান্টিক কল্পনা একে নিয়ে রুমকির সেই কবে থেকে। কিন্তু অন্য কোনও কথা না বলে প্রথমেই সে বলে

– তোমার সাথে একটা দরকার আছে।

– সিওর।

– আমার বোন ক্লাস টেনে পড়ে, পড়াশুনোয় ভাল, ওকে একটু গাইড করবে?

– ইওর সিসটার? ইলোরা? দ্যাট বিউটিফুল গার্ল? ইউ আর অজন্তা রাইট?

জবাব শুনে খানিক অবাক রুমকি, একটু হাসল শুধু।

– পড়াবে হরিহরণ?

– ইয়েস আই ক্যান টিচ হার। আই লভ টু গাইড ব্রিলিয়ান্টস। আই এম ফ্রি অ্যাট ফোর থার্টি ইন দ্য আফটারনুন, ইজ দ্যাট টাইম ওকে উইথ ইওর সিসটার? অ্যান্ড ওয়ান আওয়ার ওনলি।

– হ্যাঁ মনে হয় ওতে হবে। তাও আমি কাল তোমায় কনফার্ম করছি।

– ফাইন।

রুমকি ভাবে, ওদের দু'জনের কি আগে থাকতে ঠিক করা ছিল? হরিকে বলতেই কেমন রাজি হয়ে গেল। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগল রুমকির।

এই সপ্তাহ থেকেই পড়াতে আসছে হরিহরণ বাবলিকে। রুমকির ফিরতে দেরি হয়। ততক্ষণে ওদের পড়ানো-পড়া সব শেষ হয়ে হরিহরণ চলে যায়। কম ক্লাস থাকলেও রুমকি আগে ফিরতে পারে না। ছুটির পর কলেজের গার্ল'স বাসে করে ফেরে সে। হরিহরণ নিজের বাইকে যাতায়াত করে তাই আগে চলে আসে। নাইন থেকে টেনে খুব ভাল রেজাল্ট করল বাবলি। মা খুব খুশি। প্রবীরকাকু আজকাল রোজ আসেন না।

একদিন কলেজে খুব মাথা ধরায় রুমকি আর কলেজ বাসের জন্য অপেক্ষা না করে বাইরে থেকে বাস ধরে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ির কাছে এসে দেখে হরিহরণের বাইক। গেট খুলে বসার ঘরের সামনে এসে বাবলির গলা শুনে রুমকি থমকে দাঁড়ায়।

– তুমি বলেছিলে ফার্স্ট-সেকেন্ডের মধ্যে হলে কিছু দেবে।

– ইয়েস, আই ডোন্ট ফরগেট মাই প্রমিস, ওয়াট ড্যু ইউ ওয়ান্ট, ডিয়ার?

– ফাইভ বিগ চকোলেট বারস।

আজ শরীর খারাপ তাই সন্ধ্যেতেই রুমকি দরজা বন্ধ করেছে। ডায়ারি খুলেছে, হাতে পেন, কিন্তু কি লিখবে রুমকি? পাঁচ বছর ধরে রোজ রাতে হরিহরণকে চিঠি লেখে সে ডায়ারির পাতা ভরে। আজ যে কি লিখবে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না রুমকি।

'বাবা,

তুমি চলে যাবার পর হরি কেন এল না একবারও আমার কাছে? তাহলে তো সব এলোমেলো হত না। বাবা, বোনকে আমি বাঁচিয়েছি। বড় মেয়ের দায়িত্ব আমি পালন করেছি বাবা...'

সুদেষ্ণা দাশগুপ্ত ভারতের কবি, ছোটগল্পকার

চলচ্চিত্র

দ্য থার্ড আই ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় বাংলা ছবি

চতুর্দশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের স্লোগান ছিল– 'বেটার ফিল্ম, বেটার অডিয়েন্স, বেটার সোসাইটি'। ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবের আয়োজন করে 'রেনবো চলচ্চিত্র সংসদ'। ঢাকার পাঁচটি প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় এই চলচ্চিত্র উৎসব। ৬০টি দেশের ১৮০টি চলচ্চিত্র নিয়ে পাঁচটি প্রদর্শশালা যথা– জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তন, সুফিয়া কামাল মিলনায়তন, জাতীয় গ্রন্থাগারের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন, ধানমন্ডির অলিয়াস ফ্রঁসের মিলনায়তন এবং ই এম কে সেন্টারে আয়োজিত এই উৎসবে দর্শকরা সাগ্রহে যোগ দেন।

এ বছর মহিলা পরিচালকদের ছবির জন্য ছিল আলাদা বিভাগ। তাঁদের ছবি দেখানো হয় শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে। সাম্প্রতিককালে স্বল্প দৈর্ঘের চলচ্চিত্রের জন্য একটি আগ্রহী দর্শকমণ্ডলী তৈরি হয়েছে। এখানে দেশের ছবি ছাড়াও দেখানো হয় বিদেশি মহিলা পরিচালকদের ভিন্ন ধারার শর্ট ফিল্ম। এর মধ্যে ভারতীয় ছবি *দ্য থার্ড আই* বাংলা ছবি বলেই বাংলাদেশের দর্শকদের কাছে সাদরে গৃহীত হয়। ছবিটির শীর্ষনাম ইংরেজি হলেও এটি একটি বাংলা ছবি। নবীন পরিচালক মধুরিমা সিনহার প্রথম স্বাধীন কাজ। এর আগে অপর্ণা সেনের '*গয়নার বাক্স*'তে সহকারী পরিচালকের কাজে মধুরিমা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। বারো মিনিটের শর্ট ফিল্ম বা মিনি মুভি THE THIRD EYE (ত্রিনয়ন) তাঁর প্রথম স্বাধীন কাজ। স্বীকার করতেই হবে যে প্রথম ছবিতেই তিনি সফল। ছবির কাহিনি, সংলাপ ও পরিচালনা মধুরিমার।

আত্মশক্তির বিকাশে উদ্দীপিত আধুনিক নারীর দিনযাপনের এই কাহিনিতে নারীর স্বাধীকারের বাণী পরিচালক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গ্রথিত করেছেন। সীমিত পরিসরে শিল্পীদের দিয়ে পরিচালক তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনে সফল।

প্রধান ভূমিকায় নবাগতা প্রিয়দর্শিনী শ্রীনন্দা শঙ্কর পরিচালক মধুরিমার সঠিক ও সার্থক নির্বাচন। নায়ক চরিত্রে কলকাতার বাংলা সিরিয়ালের পরিচিত মুখ কৌশিক সুন্দর অভিনয় করেছেন। শাশুড়ির চরিত্রে মীনাক্ষী সিংহর অভিনয়ও চমৎকার। সব শেষে উল্লেখ করতে হয় শিশু শিল্পী রোরোর অনবদ্য অভিয়ের কথা। বিভিন্ন সিচুয়েশনে তার বিচিত্র অভিব্যক্তি দর্শককে মুগ্ধ করে। দেবজ্যোতি মিশ্রর সঙ্গীত সংযোজন এই ছোট ছবির সম্পদ। মধুরিমার কাজ তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে। আগ্রহী দর্শক ইউ টিউবে অনায়াসে ছবিটি দেখে নিতে পারেন।

• নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রবন্ধ

সীতা ও দ্রৌপদী

ইজাজ হোসেন

ভারতবর্ষের নারীদের একান্ত স্বামী-নির্ভর জীবনযাত্রার যে আদল দুই মহাকাব্যের অনন্যা দুই নায়িকার জীবন যাপনেও সেই একই স্রোতাবহ অনুপুঙ্খ সবার দৃষ্টিগোচরে আসে। এটা ভাল কি মন্দ সে বিচারের পূর্বে আমাদের ভেবে নিতে হয় যুগ যুগ আচরিত এই ভাবধারাই জল-অচল যে কবন্ধ রচনা করেছে, তার উর্ধ্বে ওটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। মুখের কথায় তো সবকিছু উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই আবহে ভাসতে ভাসতে ডুবতে ডুবতে যে জীবন-প্রবাহ অগ্রসরমান, তার কুটিল আবর্তই যদি একমাত্র পথরেখা হয়, তবে তা সবাইকে তো মান্য করতেই হবে। যুগ, প্রচলিত মূল্যবোধ, ধর্মের আবহ, নিয়তি– এ-সবের সঙ্গে আসে বাঁচার লড়াই। তাই ওসবগুলোকে একসঙ্গে একীভূত করা প্রয়োজন।

রামায়ণ ও *মহাভারত* মহাকাব্যের দুই নারী চরিত্র সীতা ও দ্রৌপদী আমাদের যুগ যুগ ধারাপ্রবাহি মানসিকতার সন্তান বলে মান্যবর বাল্মীকি ও ব্যাস তাঁদের জন্য আলাদা কোন বন্দোবস্তের সূচনা করতে পারেননি। এক এবং অনন্য কর্তৃত্ব শুধু স্বামীদের ওপর লম্বমান, ফলে হৃদয়বতী দুটি মহান চরিত্র প্রায় একই রকম পরিণতিতে পৌঁছেছে।

কার পরিণতি মর্মান্তিক, সীতার না দ্রৌপদীর? এ জিজ্ঞাসার সহসা কোন উত্তর নেই। দেখতে হবে প্রবাহিত সমাজ চক্রের অভ্যন্তরে কার আপন কার্যপ্রণালী অপেক্ষাকৃতভাবে আপন ভাগ্যকে অন্ধকারে অধিক নিমজ্জিত করেছে। আর কাকেই বা নিয়তি-নির্ধারিত অগ্রগামিতায় দুরপনেয় ভাগ্যহীনতার অকারণ শিকার হতে হয়েছে।

প্রথমে আমাদের আলোচ্য *রামায়ণ*। রাজশেখর বসুর অনুবাদ গ্রন্থে সীতার নামসহ তাঁর পরিচয় তাঁর বিবাহলগ্নেই সবার গোচরে আসে। তাঁর একেবারে বাল্যকালের কাহিনি অলভ্য। কিন্তু যেহেতু সেটা বিবাহ-মণ্ডপ, তাই তাঁর মুখনিঃসৃত কোন বাক্য আমাদের কানে আসে না। আবার বিবাহ-ব্যাপারটি মিটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাল্মীকি অন্য প্রসঙ্গে চলে যান– বিশেষত এবার তাঁকে রামের

অভিষেক ক্রিয়াকাণ্ডেই অধিকতর অভিনিবিষ্ট হতে দেখা যায়।

অভিষেককাহিনি সবিস্তারে বলা অনাবশ্যক। ভারত-বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষমাত্রেই সে বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত। চুম্বক কথাটি এই যে, রামের অভিষেক দশরথের অন্যতম পত্নী কৈকেয়ী দ্বারা বাধাগ্রস্ত হল। পূর্বাহ্নে প্রাপ্ত দু'টি বরের বাস্তবায়ন চাইলেন তিনি। প্রথমটি হচ্ছে রামের চোদ্দবছর বনবাস ও দ্বিতীয়টি আত্মজ ভরতের সিংহাসনলাভ। ব্যস, সমস্ত ব্যাপারটি মুহূর্তমধ্যে উল্টে গেল। তবে এখানে আমরা এই প্রথম রামচরিত্রের অপূর্ব ঋজুতা লক্ষ্য করি। তিনি ন্যায়-নীতি অনুসারে সহজ সত্যকে সোজাসুজি গ্রহণ করেন। কোন বক্রতার ধার ধারেন না।

রামের অভিষেক। সেজন্যে তিনি সজ্জিত হয়ে আপন কক্ষে আসীন ছিলেন, এমন সময়ে ডাক পড়ল পিতৃগৃহে গমনের। ত্বরায় তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে পিতার শুষ্ক মুখ দেখে বিচলিত হলেন। এমন কি, পিতা তাঁকে কোনও সম্ভাষণ পর্যন্ত করলেন না, এতে আরও বিস্মিত হয়ে কৈকেয়ীকে সবিশেষ বলার জন্য অনুরোধ করলেন। কৈকেয়ী সমস্ত ঘটনা বিবৃত করার পর রাম পিতৃসত্য গ্রহণ করবার আদম্য ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। সমস্ত লোভের ঊর্ধ্বে উঠলেন। অভিষেকক্রিয়া বন্ধ করে তিনি বনবাসেই যেতে চাইলেন। আমরা পাঠকেরা বুঝে নিলাম রাম চরিত্রের মাহাত্ম্য। রাজা বা রাজপুত্রের বীরোচিত আত্মস্বার্থ ত্যাগের নজির স্থাপিত হল।

আপন স্বার্থত্যাগী এই ইনিই হলেন সীতার স্বামী ইন্দীবরতুল্য স্বয়ং রাজপুত্র রামচন্দ্র। ভাঙেনতো কভু মচ্‌কান না। রামের বিচার সার্বক্ষণিকভাবে এই দৃষ্টিকোণ দিয়েই করতে হবে। কিন্তু আমরাতো এখানে রামের বিচারে বসিনি। আমাদের আরাধ্য দেবী সীতা স্বয়ং। তাঁর জীবনে আরোপিত অতি দুঃখের ভার কেন কি কারণে এমন অমোঘভাবে পতিত হল, তার কথাই আমাদের ভাবনার বিষয়।

এ-বিষয়ে ভাবতে গিয়ে দেখি আলোক দূরবর্তী হয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পেছনে তাঁর নিজস্ব বাগভঙ্গী, বায়নার পৌনঃপুনিকতা ও আত্মম্ভরিতার তীব্র দহন কোনটাই কম নয়। এটা সত্য যে, পুরুষপ্রধান সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের হাতে কিছু নেই, সবকিছু কর্তৃত্বের ভার পুরুষের; সেই ব্যবস্থা অনুসারে রাম যখন দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের চাপে বাধ্য হয়ে কিছু সঙ্গত উক্তি করছেন, তখন তাঁর সব কথাতেই চরম অনাস্থা প্রকাশ করলেন সীতা। যেমন চোদ্দ বছর বনবাসরূপ দণ্ডপ্রাপ্ত রাম মলিন মুখে যখন সীতা সমীপে উপনীত হলেন এবং ঘটনাটি যথাবিহিত বর্ণনা করে সীতাকে উপদেশ দিলেন: 'তুমি ব্রত-উপবাসে নিরত থাকবে, প্রত্যহ দেবার্চনার পর আমার পিতার পাদবন্দনা করবে, আমার শোকার্তা বৃদ্ধামাতা কৌশল্যার সেবা করবে, অন্য মাতৃগণকেও নিত্য বন্দনা করবে।'

তখন সীতার জবাব: 'তুমি আমাকে তুচ্ছ ভেবে কি বলছ, আমার হাসি পাচ্ছে। তোমার কথা শাস্ত্রজ্ঞ বীর রাজপুত্রের অযোগ্য এবং শোনাও উচিত নয়।'

উক্ত কথাগুলির অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন অভিমান যুক্ত থাকলেও বুঝতে হবে এখানে রাম নিজের ভাগ্যে অকস্মাৎ আরোপিত সর্বনাশা পরিণতিকে নিজের একার বহনযোগ্য মনে করছেন, কারও ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন না– কাউকে তিনি 'তুচ্ছ'ও ভাবছেন না। কিন্তু একদেশদর্শী মনোভঙ্গির কারণে সীতা ও-সব কথার পরোয়া না করে ভয়ংকর বনবাসে যাবার জন্য বায়না ধরছেন। তার বক্তব্য বিধানে এটা পরিষ্কার হচ্ছে– রামকে ছেড়ে স্বর্গবাসেও তাঁর রুচি নেই।

আমাদের মানতে হয়, সতী সর্বক্ষণে পতির দঃখে ভাবিত থাকেন এবং এক্ষেত্রে রামকে একা বনবাসে যেতে দিলে, তাঁর সঙ্গী না হলে, নিজেকে কষ্ট থেকে দূরবর্তী রাখার একটি প্রবণতা প্রকাশ পায়, তাই বলে বাস্তব বোধকে কি জলাঞ্জলি দেওয়া চলে? সেই পুরাতন দিনের সর্বনাশা দণ্ডকারণ্য, রাক্ষস, বন্যপশুআকীর্ণ দুর্গম জায়গা-জমি!

সীতার ও হেন বার্তা শোনার পরও রাম তাঁকে নিরস্ত করবার জন্যে বললেন, 'সীতা, মহাকুলীন বংশে তোমার জন্ম, তুমি ধর্মেও নিষ্ঠাবতী, অতএব এইখানে থেকেই ধর্মাচরণ কর। লতাকণ্টকে সমাকীর্ণ শ্বাপদ-সরীসৃপাদি সংকুল অরণ্যে বহু বিপদ, বহু দুঃখ। সেখানে তোমার যাওয়া উচিত নয়। সীতার জবাব: 'আমি পতিব্রতা তোমার সুখদুঃখের অংশভাগিনী, তোমাকে ভক্তি করি, আমাকে নিয়ে চল, নয়তো বিষপানে বা অগ্নিপ্রবেশে বা জলমজ্জনে প্রাণত্যাগ করব।'

এরপরও রাম যখন অনুরোধের তীব্রতা কমালেন না তখন বুদ্ধিমতী সীতাদেবীর মহান উক্তি আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ না করে পারে না। তিনি নাকি অভিমানভরে বলেই ফেললেন: 'আমার পিতা মিলিথাধিপ যদি জানতেন যে তাঁর জামাতা আকারে পুরুষ কিন্তু কার্যে স্ত্রী, তবে তিনি কি মনে করতেন!'

রামকে একেবারে লিঙ্গ পরিবর্তনের পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া। সেই রাম যিনি ধনুকে জ্যা ধরাতে গিয়ে প্রবল ধনুক একেবারে ভেঙে দিয়েছিলেন এবং তার ফলস্বরূপ সীতাকে উপহার পেয়েছিলেন।

এবং এ অধ্যায়ের শেষে সীতার আরেকটি মারাত্মক তুলনা আমাদের আরও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

'স্বয়ং তু ভার্যাং কৌমারীং চিরমধ্যুষিতাং সতীম।
শৈলূষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি ॥'

দু'পঙ্‌ক্তি শ্লোকের রাজশেখর বসু কর্তৃক অনুবাদ: 'রাম, তুমি আমাকে বালিকা অবস্থায় বিবাহ করেছ, বহুকাল তোমার সঙ্গে বাস করেছি, এখন কেন নটের ন্যায় আমাকে পরের হাতে দিতে চাও?

এখানে 'নটের ন্যায়' যার অর্থ– এতক্ষণ তাহলে অভিনেতার সংলাপ আওড়াচ্ছিলেন রাম! আশ্চর্য ভাষা ব্যবহার বটে!

শেষপর্যন্ত রামকে সম্মতি দিতে হল এবং সীতাও হৃষ্টচিত্তে অন্য কার্যাদি সম্পন্ন করতে লাগলেন।

সর্গ ৪২-৪৪-এ উপনীত হলে লক্ষ্য করি রাম-সীতা-লক্ষ্মণ বনভূমিতে স্থিত হয়েছেন। এ স্থানে রাম ও লক্ষ্মণের বহু রাক্ষস বধ ও বিশেষত শূর্পনখার নাসিকা ছেদন ক্রিয়ায় লঙ্কার রাজা রাবণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি এর প্রতিশোধ নিতে চান। সেজন্যে মারীচকে মায়ামৃগ সাজিয়ে সীতার সামনে দিয়ে চরে বেড়াতে বলেন। সীতা রজতবিন্দু চিত্রিত মৃগের রূপসৌন্দর্যে মোহিত হন। তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে ডেকে মৃগটিকে দেখান এবং এটিকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় তাঁকে উপহার দিতে অনুরোধ করেন।

বাস্তব বুদ্ধিসম্মত লক্ষ্মণ মৃগটিকে চাক্ষুষ করে সন্দিগ্ধ হন। তিনি অনায়াসে সেটিকে মায়ামৃগ বলে সনাক্ত করেন। কিন্তু মৃগরূপমুগ্ধ সীতা লক্ষ্মণকে বাধা দেন। এবং 'নিজের কামনা পূরণের জন্য এরূপ অনুরোধ করা স্ত্রীর পক্ষে অনুচিত' এমন বোধ থাকা সত্ত্বেও তিনি হরিণটিকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন।

সীতার অনুরোধ রক্ষার্থে রাম হরিণ শিকারে বেরিয়ে পড়েন। যাওয়ার সময় লক্ষ্মণকে সাবধান করেন: 'আমি শীঘ্রই মৃগ নিয়ে ফিরে আসছি তুমি ততক্ষণ সর্ববিষয়ে সতর্ক হয়ে জানকীর সঙ্গে আশ্রমে থাক।' রামের এমন সতর্কবার্তা আমাদের ভুললে চলে না। যাই হোক, অনেক রকম খেলা দেখিয়ে হরিণটি রামকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায়। শেষে ব্রহ্মা নির্মিত সূর্যরশ্মিতুল্য দীপ্ত বাণে তিনি হরিণটিকে বিদ্ধ করেন। মৃত্যুকালে হরিণরূপী মারীচ নিজরূপ ধারণ করে লক্ষ্মণকে সীতার কাছ থেকে সরাবার অভিপ্রায়ে রামের কণ্ঠ নকল পূর্বক 'হা সীতা, হা লক্ষ্মণ বলে চিৎকার করে ওঠে।

৪৫-তম সর্গের শুরু এবার। স্বয়ং মহাকবি বাল্মীকি এ সর্গটির নামকরণ করেছেন– 'সীতার মতিভ্রম'। এখানে সীতার অন্তরচরিত্রের কথকতা উন্মুক্ত হয়েছে।

রামকণ্ঠের অনুরূপ আর্তস্বরে সীতা ব্যাকুল হয়ে লক্ষ্মণকে সাহায্যের জন্যে রাম সমীপে যেতে বললেন।

রামের আজ্ঞা স্মরণ করে লক্ষ্মণ যেতে অস্বীকার করলেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সীতা সেই সর্বজনবিদিত উক্তিটি আওড়ালেন– 'সৌমিত্রি তুমি তোমার ভ্রাতার মিত্ররূপী শত্রু, সেজন্যে এ অবস্থাতেও তাঁর কাছে যাচ্ছ না। তুমি আমাকে পাবার লোভে তাঁর মৃত্যু কামনা করছ, তোমার ভ্রাতৃস্নেহ নেই।'

এমন বাক্য শুনলে মানুষমাত্রেরই রাগ হয়। কিন্তু লক্ষ্মণের তাতে রাগ হল না। তিনি বরং রামের নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ করে সীতাকে প্রবোধ দিতে চাইলেন: 'যা শুনেছেন তা রামের স্বর নয়, কোনও দেবতাও নয়, এই আর্তধ্বনি গন্ধর্বনগর তুল্য রাক্ষসী মায়া। রাম আপনাকে আমার তত্ত্বাবধানে রেখে গেছেন, আমি আপনাকে ছেড়ে যেতে পারি না।'

ব্যাকুল সীতা এবার ক্রুদ্ধ হলেন, বললেন: 'আমার মনে হচ্ছে রামের মহাবিপদ তোমার কাম্য, তাই এমন কথা বলছ। লক্ষ্মণ তোমার ন্যায় নির্দয় কপটাচারী জ্ঞাতিশত্রু যে পাপ কার্য করবে তা বিচিত্র নয়। তুমি অতি দুষ্ট, তাই আমার জন্য অথবা ভরতের প্ররোচনায় একাকী প্রচ্ছন্নভাবে রামের

সঙ্গে বনে এসেছে।' তারপর যা বললেন সেটা প্রায় অশ্রাব্য লক্ষ্মণের কাছে, এমনকি আমাদেরও কাছে। 'সৌমিত্রি তোমার বা ভরতের অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে না ইন্দীবরশ্যাম পদ্মচক্ষু রামকে পতিরূপে ভোগ করে নীচ জনকে কি করে কামনা করব?'

আশ্চর্য, সীতার এমন ক্রুর ও হীন বাক্যে লক্ষ্মণ এবারও ক্রোধান্বিত হলেন না বরং কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন: 'আপনি আমার দেবতার তুল্য, আপনার কথার উত্তর দিতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।... বনদেবতারা শুনুন, তাঁরা সাক্ষি, আমার ন্যায্য কথার উত্তরে আপনি কঠোর বাক্য বলেছেন। রাম আমার গুরুজন আমি তাঁর আজ্ঞা পালন করছিলাম, আপনি স্ত্রী সুলভ দুষ্টস্বভাবের বশে আমাকে আশঙ্কা করেন। কাকুৎস্থ যেখানে আছেন সেখানে আমি যাচ্ছি, আপনার মঙ্গল হোক।' এই বলে তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন। রামের জন্য উৎকণ্ঠাই সীতাকে ধৈর্যহীন করেছে এটা স্বীকার্য, কিন্তু এখানে কটুবাক্য ব্যবহারই সর্বনাশের সম্ভবত মৌল কারণ।

প্রথমে স্বামী ও পরে দেবর অন্তর্হিত হলে সেই ঘোর বনে সীতা একাকী রইলেন। এবং সেই একাকীত্বের সুযোগটি গ্রহণ করলেন রাক্ষস রাজা রাবণ।

রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হলেন মিথিলার রাজকন্যা বা অযোধ্যার রাজপুত্রবধূ।

নিয়তির এই যে নির্মমতা এঁদের ওপর একের পর এক ঝরে ঝরে পড়ছে, এরজন্য রাম কতটুকু দায়ী, লক্ষ্মণের দায়ভাগও বা কতখানি, আর সীতা?

আমরা বলতে চাইনে, এর দায়ভাগ সম্পূর্ণ একা সীতার। কিন্তু কষ্টকর ব্যাপার এই যে, তাঁকেই তো সবচেয়ে গ্লানিকর পরিণতিতে পৌঁছতে হল সবার আগে। তাই একটু সচেতন হলে, কথাবার্তা ও আচরণে সংযত হতে পারলে এমন উপসংহার কি এড়ানো যেত না?

তারপর যুদ্ধ, হত্যা, কূটনীতির বহুল প্রসার। আর সবশেষে রাজ্য, সমাজ ও গোত্রপ্রীতির টানাপোড়েনে মনোহারিণী সীতার অকালে সশরীরে নাগলোকে অর্থাৎ পাতাল প্রবেশ।

এবার মহাভারতের কথকতা। সীতার মত দ্রৌপদীর জীবন-পরিণাম অত দুঃখের নয়– আবার তেমন সুখেরও নয়। ভাবতে অবাক লাগে প্রাচীন দুই মহাকবি কি আশ্চর্য কারুকর্মিতায় আমাদের সামনে দুই সৌন্দর্যময়ী নারী প্রতিমা উপস্থাপিত করে তাঁদের বিষাদঘণ পরিণতি দেখাতে তৎপর হয়েছেন। দুইজনেরই ভাগ্যে নির্মম মৃত্যু তাদের জীবনের যবনিকা টেনে দিয়েছে; তবে সীতার ক্ষেত্রে অধিকাংশ দুর্বিপাক অনেকটা তাঁর নিজস্ব কৃতকর্মে সাধিত হয়েছে, আর দ্রৌপদীর হয়েছে অলঙ্ঘ্য নিয়তির বিধান মেনে।

দ্রৌপদীকেও স্বয়ংবর সভায় আমরা প্রথম দেখেছি। ভ্রাতা ধৃষ্টাদ্যুম্নের সঙ্গে নববধূর সজ্জায় অকুতোভয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন। সবাই তাঁকে দেখে মোহিত হলেন। ব্রাহ্মণবেশী পঞ্চপাণ্ডবও তাঁকে দেখে কন্দর্পবাণে আহত হলেন। একে একে ধনুকে লক্ষ্যভেদ করার জন্য সব রাজা এগিয়ে এলেন। কিন্তু কেউ কৃতকার্য হলেন না। এবার এলেন সূর্যপুত্র তাঁর বীরত্ব দেখাতে। কর্ণ ধনুক স্পর্শ করামাত্র সেই নিস্তব্ধ স্বয়ংবর সভায় দ্রৌপদী, উচ্চস্বরে বলে উঠলেন: 'আমি সূতজাতীয়কে বরণ করব না।' কর্ণ ক্ষান্ত হলেন।

এরপর অন্যান্য প্রায় সব রাজার কীর্তি শেষ হলে এলেন ধনুর্ধর অর্জুন। তিনি ধনুকে অনায়াসে গুণ পরিয়ে পাঁচটি শর সন্ধান করে যন্ত্রের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যভেদ করলেন। কুমারী কৃষ্ণা অর্জুনের বক্ষে শুক্ল বরমাল্য লম্বিত করলেন। তাঁর মুখমণ্ডল নীরব হাসিতে পরিপ্লুত হল।

সীতার কথা বলার সুযোগ ছিল না। কিন্তু দ্রৌপদী সুযোগ বুঝে জাত পাতের বিচার বিষয়ে নিজের অকুণ্ঠ মত জোর গলায় ব্যক্ত করেছেন। অতঃপর অর্জুনের কণ্ঠে মালা দুলিয়ে পছন্দের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এই অর্থে বোঝা যাচ্ছে, আপন রুচি অনুসারে চলার ইচ্ছে তাঁর অন্তরে প্রবলভাবে স্থিত।

খাণ্ডবপ্রস্থে পাণ্ডবেরা সুখে সমৃদ্ধিতে রাজত্ব করছেন। কিন্তু ঐ সুখ-সমৃদ্ধি তাঁদের পক্ষে কাল হয়ে দাঁড়াল। দুর্যোধন অসূয়াবশত কিছুতেই পাণ্ডবদের বিজয় কেতন সহ্য করতে পারেননি। অনবরত কুমন্ত্রণা ও হীন স্বার্থ সাধনের চেষ্টায় রত ছিলেন। শেষে মামা শকুনির মন্ত্রণায় পাণ্ডবদের দ্যুৎক্রীড়ায় আমন্ত্রণ জানালেন। একপাশে কুচক্রী ও সুচতুর শকুনি অন্যপাশে উদার হৃদয় শীতল স্বভাবের স্বয়ং যুধিষ্ঠির দ্যুৎক্রীড়ায় রত হলেন। এর ফলাফলে শকুনির সর্বপ্রকার জয় ও যুধিষ্ঠিরের সর্বপ্রকার পরাজয় প্রতিষ্ঠিত হল। সহায়-সম্পদ সব হারিয়ে প্রথমে নিজেকে অতঃপর ভাইদের খেলায় পণ রেখেও হেরে গেলেন। শকুনির কথায় শেষে দ্রৌপদীকে পণ রাখলেন। এবং তাঁকেও হারালেন। খেলায় জিতে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রমুখেরা দ্যুৎসভায় দ্রৌপদীকে সশরীরে উপস্থিত হতে আদেশ পাঠালেন। সব শুনে দ্রৌপদী স্তব্ধবাক হলেন, শুধু জিজ্ঞেস করলেন: যুধিষ্ঠির নিজেকে পণ রাখার আগে আমাকে পণ রেখেছিলেন তো?

দ্রৌপদী দ্যুৎসভায় এলেন। সরাসরি প্রশ্ন তুললেন, 'এই সভায় কুরু বংশীয়রা রয়েছেন, এরা কন্যা ও পুত্রবধূদের অভিভাবক, সুবিচার করে বলুন আমাকে জয় করা হয়েছে কি না?'

কিন্তু দুর্জনেরা কি কোন যুক্তি মানে! সেই সভামধ্যে দুঃশাসন তাঁকে দাসী আখ্যা দিল। এবং কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রৌপদী যে বিজিত সে সাফাই গাইলেন। অধিকন্তু 'আরও শোন' বলে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন– 'স্ত্রীদের এক পতিই বেদবিহিত, দ্রৌপদীর অনেক পতি, অতএব এ বেশ্যা।'

এরপর সেই দুঃশাসন একবস্ত্রা রজঃস্বলা দ্রৌপদীর শাড়ি টেনে খুলবার উপক্রম করল। কিন্তু ধর্ম সহায়। তিনি অনবরত বস্ত্র যোগান দিয়ে দ্রৌপদীকে মানহানি থেকে বাঁচালেন। এই ঘটনা তাঁর অস্তিত্বের ওপর প্রবল আঘাত হানল। কেন না তাঁর ব্যক্তিগত কোন অসদাচরণে এই দুঃসহ পরিণতি কাঁধে চাপেনি। তিনি নিজে এই ক্রীড়ামোদ থেকে শতহস্ত দূরে ছিলেন। তাছাড়া তাঁর অমোঘ প্রশ্ন ও যুক্তি 'যুধিষ্ঠির আগে নিজেকে না আমাকে পণ রেখেছিলেন, আগে নিজেকে রাখলে আমি বিজিত হই কি প্রকারে? কিন্তু তাঁর কথা কেউ শুনল না। বিচার পেলেন না তিনি। উপরন্তু তাঁকে পড়তে হল লজ্জাকর হীন অবস্থায়। এ মর্মন্তুদ বেদনার সান্ত্বনা কোথায়!

পুত্রদের অসভ্য কৃতকর্মে দ্রৌপদীর ওপর স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠলেন ধৃতরাষ্ট্র। তিনি তাঁকে বর দিতে চাইলেন। দ্রৌপদী প্রথম ও দ্বিতীয় বরে পাণ্ডবদের পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে অ্যনলেন। তৃতীয় বর দিতে চাইলে তিনি স্রেফ না বলে দিলেন। অতিরিক্ত চাহিদার দ্বারস্থ তিনি হতে চাইলেন না। দ্রৌপদীর চরিত্রের এরূপ সংযমের চিহ্ন নিশ্চিত প্রশংসার দাবিদার।

কিন্তু কি আশ্চর্য পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার পর যুধিষ্ঠির আবার ক্রীড়ায় মগ্ন হলেন। এবার পাণ্ডবদের কপালে জুটল বার বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাস।

বলুন, এবার দ্রৌপদীর করণীয় কি?

সাত্যকির কাছে সব শুনে কৃষ্ণ তাঁদের দেখতে এলেন। দ্রৌপদী তাঁর কাছে সব ঘটনা খুলে বললেন। শেষে মনঃদুঃখে অধীর হয়ে বলতে লাগলেন: 'মধুসূদন, আমার পতি নেই, পুত্র নেই, বান্ধব ভ্রাতা পিতা নেই, তুমিও নেই। ক্ষুদ্রেরা আমাকে নির্যাতিত করেছে, তোমরা শোকশূন্যের ন্যায় তা উপেক্ষা করেছ। তখন কর্ণ যে আমাকে উপহাস করেছিল সেই দুঃখও আমার দূর হচ্ছে না।'

কৃষ্ণ তাঁকে তখন আশ্বস্ত করলেন: 'পাণ্ডবদের জন্য যা সম্ভবপর তা আমি করব, তুমি শোক কোরো না।'

পাণ্ডবগণ বনে যাত্রা করলেন।

সীতার এমন কেউ ছিল না যার কাছে মনের আক্ষেপ ব্যক্ত করা যায়। বাল্মীকি মেধাবশত তাঁর মনের কথা জানতে পারতেন, সে কথা আলাদা, আসলে পৃথিবীতে সীতার কষ্টের দোসর কেউ ছিল না। সেক্ষেত্রে দ্রৌপদী ভাগ্যবতী। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর সখা, তাঁর চিন্তার সমর্থক, মানসিক আশ্রয়দাতা।

সীতার প্রকৃতি গড়ে উঠেছিল রামের সাহচর্যে, একেবারে বালিকা বয়সে তাদের বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা শ্বশুরালয়ে ধীরগতিতে বেড়ে উঠেছিল। তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন, অর্পিত দায়িত্ব পালনে রামের সমকক্ষ কেউ নেই। তাই কী সাংসারিক কাজে-কর্মে অথবা কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে তাঁকে কোন কথা বলতে হয়নি। এসব বিষয়ে তিনি সর্বদা নিশ্চুপই ছিলেন।

অথচ দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

মহাভারতের কাহিনিতে আমরা দেখেছি, যুধিষ্ঠির রামের মত নন। তিনি কোন দায়-দায়িত্বের ধার ধারেন না। নিজের একান্ত ইচ্ছাকে সর্বপ্রাধান্য দেন। দু'দুবার দ্যুৎক্রীড়ার ক্ষেত্রে এটি পরিস্ফুট হয়েছে। তাই বিবেচনার বিষয়গুলি নিয়ে পার্শ্ববর্তিনী দ্রৌপদীকে ভাবতে হয়, কথা বলতে হয়। তাঁকে নীরব থাকলে চলে না।

মহাভারতে উক্ত 'দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠিরের বাদানুবাদ' অধ্যায়টি উপরোক্ত কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হয়তো দ্রৌপদীর কোন কোন যুক্তি কিছুটা মলিন কিন্তু

সার্বিক বিচারে তাদের মূল্য কিছুতেই কম নয়। তাঁর কথাগুলি যেন কষ্টের সমুদ্রে সন্তরণরত কোন বেদনার্ত হৃদয়ের আর্তি।

আমরা দ্রৌপদীর কথার প্রতি সযত্ন মনোনিবেশ দান করি:

১. তুমি (যুধিষ্ঠির) পূর্বে শুভ্র কৌষেয় বস্ত্র পরতে, এখন তোমাকে চীরধারী দেখছি। কুন্তলধারী যুবক পাচকগণ সযত্নে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে তোমাদের খাওয়াত, এখন তোমরা বনজাত খাদ্যে জীবন ধারণ করছ।

২. বনবাসী ভীমসেনের দুঃখ দেখে কি তোমার ক্রোধবৃদ্ধি হয় না? বৃকোদর একাই কৌরবদের বধ করতে পারেন, কেবল তোমার জন্য কষ্ট সইছেন।

৩. পুরুষ ব্যাঘ্র অর্জুন আর নকুল-সহদেবের দুর্দশা দেখেও কি তুমি শত্রুদের ক্ষমা করতে?

৪. দ্রুপদের কন্যা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, পতিব্রতা বীরপত্নী আমাকে বনবাসিনী দেখেও কি তুমি সয়ে থাকবে?

৫. লোকে বলে ক্রোধশূন্য ক্ষত্রিয় নেই, কিন্তু তোমাতে তার ব্যতিক্রম দেখছি।

৬. তুমি বহুপ্রকার যজ্ঞ করেছ তথাপি বিপরীত বুদ্ধি বশে দ্যুৎক্রীড়ায় রাজ্য, ধন, ভ্রাতৃগণ আর আমাকেও হারিয়েছ। তুমি সরল, মৃদুস্বভাব, বদান্য, লজ্জাশীল সত্যবাদী, তথাপি দ্যুতব্যসনে তোমার মতি হল কেন?

৭. মহারাজ, বিধাতা প্রাণিগণকে মাতা-পিতার দৃষ্টিতে দেখেন না, তিনি রুষ্ট ইতরজনের ন্যায় ব্যবহার করেন। তোমার বিপদ আর দুর্যোধনের সমৃদ্ধি দেখে আমি বিধাতারই নিন্দা করছি, যিনি এই বিষম ব্যবস্থা করেছেন।'

এর উত্তরে সাধারণ মানুষ যেমন বলে, যুধিষ্ঠিরের কথাটায় তার ব্যত্যয় ঘটল না– 'যাজ্ঞসেনী, তোমার কথা সুন্দর, আশ্চর্য ও মনোহর, কিন্তু নাস্তিকের যোগ্য।' দ্রৌপদী বললেন, 'আমি ধর্মের বা ঈশ্বরের নিন্দা করি না, দুঃখার্ত হয়েই অধিক কথা বলেছি।' শেষে বললেন, 'তুমি প্রসন্ন হয়ে শোন: মহারাজ, তুমি অবসাদগ্রস্ত না হয়ে কর্ম কর।... নিজ কর্মের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ ফল লাভ হয়, তাই পৌরুষ।'

আমাদের উদ্ধৃতি শেষ হল। মহাকবি ব্যাস দ্রৌপদীর মুখনিঃসৃত বস্তুনিষ্ঠ যে অমৃতভাষণ শোনালেন, তার কি কোন তুলনা হয়!

গুণবতী ও রূপবতী নারী দ্রৌপদীর সমস্যার শেষ নেই। পঞ্চস্বামী কর্তৃক রক্ষিত হয়েও তাঁর বিপদ কাটে না। দ্রৌপদীকে আশ্রয়ে রেখে পঞ্চভ্রাতা শিকারে বেরুলেন। সে সময় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কাম্যক বনে উপস্থিত হলেন। বিবাহোপলক্ষে তিনি শাল্বরাজ্যে যাচ্ছিলেন। দ্রৌপদীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। শুরু করলেন দ্রৌপদীকে পাবার প্রচেষ্টা। জয়দ্রথ তাঁকে আহ্বান করলেন। সতী সাধ্বী তেজস্বী নারী কি সে আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন? কোন প্রকারে রাজি না হওয়ায় জয়দ্রথ বলপূর্বক তাঁকে ধরতে গেলেন। দ্রৌপদী তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন। জয়দ্রথ ভূমিশয্যা থেকে উঠে এবার সবলে দ্রৌপদীকে পাঁজাকোলা করে নিজের রথে উঠলেন।

অবশ্য এর পরিণতি ভাল হয়নি। ভীমের হাতে পড়ে তাকে দারুণ নাস্তানাবুদ হতে হয়। প্রহারে জর্জরিত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অবশেষে 'আমি পাণ্ডবদের দাস' এই বাক্য উচ্চারণ করে তিনি মুক্তি পেলেন। আমাদের জিজ্ঞাসা: দ্রৌপদী কি দোষে এমন অপমানিত হলেন? কার দোষেই বা এটা ঘটল?

দ্রৌপদীর অপমানের এবার আরেক নব অধ্যায়।

তখন পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময়। পঞ্চস্বামীসহ দ্রৌপদীরা বিরাট রাজার সভায় উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠিরসহ সবাই সেখানের রাজদরবারে প্রতিষ্ঠা পেলেন। আর দ্রৌপদী পেলেন বিরাট রাজমহিষী সুদেষ্ণার গৃহে আশ্রয়। সব চলছিল ভাল কিন্তু একদিন সুদেষ্ণার ভ্রাতা রাজসেনাপতি কীচক দ্রৌপদীকে দেখে ফেলেন। অতুলনীয় রূপলাবণ্যে ভরভরন্ত এ রমণীটি কে? যে-ই হোক, শুরু হয়ে গেল জয়দ্রথের মত তারও লালসা-বিহ্বল কৃতকর্মের তাল-বাহানা। তাঁকে রানী করবার প্রস্তাবও এসে গেল। দ্রৌপদী অনেক কষ্টে তাকে নিবারণ করলেন। কিন্তু দুর্জনের ইতরতা কি সহসা থামে! ভগ্নির কাছে দ্রৌপদীকে পাবার প্রস্তাব করলেন। সে অনুযায়ী সুদেষ্ণার আদেশে গররাজি থাকা সত্ত্বেও দ্রৌপদীকে পানীয় নিয়ে কীচকের ঘরে ঢুকতে হল। ব্যস, সুযোগ এসে গেছে মনে করে 'কীচক তাঁর হাত ও উত্তরীয় ধরলেন। দ্রৌপদী ঠেলা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলেন। কীচক সবলে আবার ধরলেন, দ্রৌপদী কম্পিত দেহে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে প্রবল ধাক্কা দিলেন, পাপাত্মা কীচক মাটিতে পড়ে গেলেন। দ্রৌপদী দ্রুতবেগে বিরাটরাজার সভায় এলেন, কীচক সঙ্গে সঙ্গে এসে রাজার সমক্ষেই দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে তাঁকে পদাঘাত করলেন।'

সে সভায় যুধিষ্ঠির, ভীম সবাই উপস্থিত ছিলেন। নির্মম অপমানকর এ-ঘটনা তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন। ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে কীচকের দিকে তাকালে যুধিষ্ঠির ইঙ্গিতে তাঁকে থামিয়ে দিলেন।

অজ্ঞাতবাসকালে স্বামীদের পরিচয় দিতে নিষেধ থাকায় অসহায় একাকী সুন্দরী ললনার এ কি করুণ দশা! হায়, তাঁর একি বিপর্যস্ত অবস্থা!

আমরা বুঝতে পারি: সনাতন বলশালী-দুর্জন, কামকাতর পুরুষের কাছে এই হচ্ছে জীবনোপভোগের একমাত্র পন্থা।

অবশ্য জয়দ্রথের মত একেও এর মাশুল গুণতে হয়েছিল শুধু প্রহৃত হয়ে নয়, জীবনের বিনিময়ে।

মহাভারতের পৃষ্ঠায় আমরা আরও দু'একবার দ্রৌপদীকে দেখি। শ্রীকৃষ্ণপত্নী সত্যভামার সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতা, যেখানে প্রকৃত সত্যসন্ধ নির্ভীক তেজোদীপ্ত তাঁর এক মহিমাময় মূর্তি ভেসে ওঠে, অনায়াস দৃষ্ট হয় প্রকৃত শিক্ষার আলোকসঞ্চারী এক অভীপ্সা।

এরপর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। পাণ্ডবদের অবিসংবাদিত জয়ের মুখে পরাজয়ের এক গ্লানিকর পরিণতি। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার পাণ্ডবগৃহে প্রবেশ এবং এক এক করে দ্রৌপদীর সবক'টি সন্তানকে হত্যা। এখানেই যেন ঘটে গেল তাঁর আত্মিক মৃত্যু। হাহাকারভরা জীবনের অন্তিম আলেখ্য।

মহাপ্রস্থানের পথে হিমালয় পর্বত পার হবার পর দ্রৌপদীর শারীরিক মৃত্যুর কথা আছে বটে, কিন্তু সেখানে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি বরং যেন কিছুটা দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। উদ্ধৃতি: 'যেতে যেতে সহসা দ্রৌপদী যোগভ্রষ্ট হয়ে ভূপতিত হলেন। ভীম যুধিষ্ঠিকে বললেন, দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কোনও অধর্মাচরণ করেননি, তবে কেন ভূপতিত হলেন? যুধিষ্ঠির বললেন, ধনঞ্জয়ের উপর এর বিশেষ পক্ষপাত ছিল। এখন তারই ফল পেয়েছেন।'

যুধিষ্ঠিরের এ-কথায় আমাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। তাঁর সবগুণ বাদ দিয়ে এই দোষে দোষী করা হল! হায়! দ্রৌপদীর জ্যেষ্ঠ আর্যপুত্র, আপনার কৃতকর্মের ফলভাগী হয়ে যে অনন্যা নারী সারাজীবন কঠিন অগ্নিতাপে জ্বলেছেন, নিজে সামান্য অন্যায়টুকুও করেননি, মৃত্যুর পরে তাঁকে এই অপবাদ! শুধু কি এখানে শেষ? নারীমৃত দেহটি পথে-প্রান্তরে ফেলে যুধিষ্ঠির 'সমাহিত মনে চলতে লাগলেন, দ্রৌপদীর দিকে আর দৃকপাত করলেন না।'

আমাদের ক্ষোভ, দ্রৌপদী তবে সারাজীবন কাদের জন্য কি করলেন? না, এই-ই পৃথিবীর নিয়ম?

সীতার দুঃখ রাম তাঁকে ঠিকমত বুঝলেন না, তাঁকে বিশ্বাস করলেন না, যার জন্যে তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত হল। দ্রৌপদীর সে দুঃখ কম। তিনি জীবিত থাকতে পঞ্চস্বামীর কেউই তাঁকে কখনও হতশ্রদ্ধা করেননি, অবিশ্বাস করেননি, দ্রৌপদীর দুঃখ সব বহিরাগত। দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, জয়দ্রথ, কীচক এদের কারু সঙ্গে জীবনে কোনদিন বাক্যালাপ না করলেও তাঁর কিছু ইতরবিশেষ হত না। কিন্তু তারাই সবে তাঁর দুঃখের মূল আকর।

রাবণ হত হলেন, যুদ্ধে জয় হল। সীতা স্বামীর সঙ্গে দেখা করার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, লক্ষ্যযোগ্য এই যে, এই আগ্রহ কিন্তু রামের তরফ থেকে নেই। প্রজারঞ্জক রাজা হবেন তিনি, তাই যে নারী রাক্ষস কর্তৃক অপহৃতা, তাঁকে পূর্ব মর্যাদা দেন কি করে? সীতাকে দেখামাত্র তির্যক মন্তব্য তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিলেন: 'সীতা, তুমি রাক্ষস কর্তৃক অপহৃতা হয়েছে, সে তোমাকে দুষ্ট চোখে দেখেছে, তুমি অপর কারু কণ্ঠলগ্না হও।' অথবা আরও বৃহৎ আঘাত: 'সীতা, তুমি দিব্যরূপা মনোরমা, রাক্ষস তোমাকে স্বগৃহে পেয়ে বেশীক্ষণ ধৈর্যাবলম্বন করেনি।'

এমন মন্তব্যের প্রতিবাদে সীতা শুধু বলতে চাইলেন, 'এটা প্রাকৃতজনের ভাষা'। অগ্নিপরীক্ষার পরে সেই সীতাকে রাম গ্রহণ করলেন এবং অযোধ্যায় ফিরে জনরবের কাছে হার মেনে আবার তাঁকে বিদায়ও দিলেন। পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নয়, বাহ্য ঘটনা ও জনরবের কাছে মাথা নোয়ালেন রাম, এটাই সীতার পাতাল প্রবেশের মুখ্যতম কারণ। যে জিনিশটি ঘটেছে সীতার মৃত্যুর আগে– প্রায় সেরূপ অপ্রিয় ব্যাপারটি ঘটল দ্রৌপদীর মৃত্যুর পর। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর সাধের দ্রৌপদীর দিকে আর একবারও ফিরে তাকালেন না।

ইজাজ হোসেন
শিক্ষাবিদ প্রাবন্ধিক

অনুবাদ গল্প

ঐ চোখ দু'টিতে

রাসকিন বন্ড

রোহানা পর্যন্ত ট্রেনের কামরায় আমি একাই ছিলাম। এখান থেকে একটি মেয়ে ট্রেনে উঠল। যারা তাকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন তারা সম্ভবত তার বাবা-মা। মেয়েটির সুযোগ-সুবিধা নিয়ে তারা বেশ উদ্বিগ্ন। ভদ্রমহিলা তাকে পই পই করে বলে দিলেন কোথায় জিনিসপত্র রাখবে, কোথায় বসবে, যেন জানলা দিয়ে না ঝোঁকে বা অপরিচিত যাত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপ এড়িয়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারা তাদের শেষ কথাগুলো বলে নিলেন আর ট্রেনটাও প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল। যেহেতু সেই সময়ে আমি পুরোপুরি অন্ধ, আমার চোখ দু'টো শুধু তীব্র আলো বা অন্ধকার বুঝতে পারে। আমি বলতে পারব না মেয়েটি কেমন দেখতে; কিন্তু তার পায়ের চলার শব্দ থেকে বুঝতে পেরেছিলাম সে হাওয়াই চটি পরেছিল।

আমার কিছুটা সময় লাগবে মেয়েটির সৌন্দর্য খুঁজে বের করতে, হয়তো বা তা কখনই পারব না। কিন্তু তার গলার স্বরটি আমার ভাল লেগেছিল, এমন কি তার চটির শব্দও।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি একেবারে দেহারা পর্যন্ত যাবেন?'

আমার গলার স্বর শুনে সে বোধহয় কিছুটা চমকে গেল, হতে পারে আমি যে জায়গাটায় বসে আছি সেটা বেশ অন্ধকার। কিছুটা বিস্ময়ের সুরেই সে বলল, 'আমি বুঝতে পারিনি এখানে কেউ বসে আছে।'

ঠিকই এটা মাঝে মাঝে হয় যাদের দৃষ্টি শক্তি ভাল তারা তাদের চোখের সামনের জিনিস অনেক সময় লক্ষ্য করে না। আমার মনে হয় আসলে তাদের তো অনেক কিছু দেখতে হয়! অন্যদিকে যারা দেখতে পায় না (বা কম দেখে) তাদের তো হাতের সামনে প্রয়োজনীয় যা কিছু ইন্দ্রিয়তে সাড়া দেয় তাই গ্রহণ করতে হয়।

'আমিও আপনাকে দেখিনি, কিন্তু আপনার আসার শব্দ পেয়েছি।'

ভদ্রলোকের গলাটা কেমন দ্বিধান্বিত শোনাল, ‘আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। আসলে আমি তার চোখ দুটো লক্ষ্য করছিলাম, তার চুলটা নয়। তার চোখদুটো খুব সুন্দর– কিন্তু মেয়েটির কাছে তার কোন দাম নেই। মেয়েটি পুরোপুরি অন্ধ। কেন, আপনি খেয়াল করেননি?’

আমি ভাবছিলাম আমি যে অন্ধ এই সত্যিটা কি তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারব! হয়তো যদি নিজের সিটেই বসে থাকি কাজটা বোধহয় কঠিন হবে না।

মেয়েটি বলল, ‘আমি সাহারানপুর নেমে যাব। ওখানে আমার কাকিমা অপেক্ষা করছেন।’

‘তাহলে আপনার সঙ্গে বেশি গল্পটল্প করে লাভ নেই’, আমি উত্তর দিলাম, ‘কাকিমারা সাধারণত বেশ রাগী হন।’

সে জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি কোথায় যাচ্ছেন?’

‘প্রথমে দেহারা, তারপর মুসৌরি।’

‘বাঃ কি ভাগ্যবান আপনি। আমারও ইচ্ছে করে মুসৌরি যেতে। আমার পাহাড় খুব ভাল লাগে, বিশেষ করে অক্টোবর মাসে।’

‘হ্যাঁ ওটাই সেরা সময়।’ আমার স্মৃতি হাতড়ে বললাম, ‘পাহাড়ে পাহাড়ে তখন কত ডালিয়া ফুল ফুটে থাকে। সূর্য কি সুন্দর মিষ্টি আলো ছড়ায়। আর রাতে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে বসে বসে একটু ব্র্যান্ডি খেতে পারেন। অধিকাংশ পর্যটক ফিরে যাওয়ায় রাস্তাঘাট একেবারে শান্ত থাকে বলতে পারেন প্রায় নির্জন। মানতেই হবে অক্টোবরটাই সেরা সময়।’

সে একেবারে নীরব। আমি ভাবতে লাগলাম আমার কথাগুলো কি তাকে মোটেই স্পর্শ করেনি, না কি আমাকে ভাবছে এক রোমান্টিক হাঁদা! তারপরই আমি একটা ভুল করে বসলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘বাইরেটা এখন কেমন দেখছেন?’

মনে হল আমার এ প্রশ্নে সে অদ্ভুত কিছুই পেল না। সে কি ইতোমধ্যেই বুঝে ফেলেছে যে আমি অন্ধ? কিন্তু এরপরই সে যে প্রশ্ন করল তা আমার সন্দেহ দূর করে দিল।

সে জিজ্ঞাসা করল, ‘কেন আপনি জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখে নিতে পারছেন না?’

আমি খুব সহজভাবে বার্থের পাশে সরে এলাম এবং জানালার ধারটা বুঝে নিয়ে বাইরে তাকালাম। ভান করলাম যে আমি বাইরের শোভা দেখতে দেখতে যাচ্ছি। ইঞ্জিনের ঘড় ঘড় কি চাকার ঘস ঘস শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম আর মনশ্চক্ষে দেখতে পারছিলাম টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলো সব পিছনে সরে যাচ্ছে।

আমি কথা বলে উঠলাম, ‘আপনি কি খেয়াল করেছেন যে গাছগুলো সব ছুটছে মনে হচ্ছে আর আমরা স্থির বসে আছি?’

‘এরকমটাই তো সব সময় হয়,’ সে বলল, ‘আপনার চোখে কি কোন জন্তু জানোয়ার ধরা দিল?’ খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দিলাম, ‘না তো!’

আমি জানতাম দেহারার কাছাকাছি জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার আর বেশি নেই। জানালা থেকে মুখ সরিয়ে আমি মেয়েটির দিকে ফিরলাম আর বেশ কিছুক্ষণ চুপটি করে বসে রইলাম।

‘আপনার মুখটি কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং’, আমি মন্তব্য করলাম। আমি কি একটু সাহসী হয়ে উঠছি! কিন্তু এটা বোধহয় নিরাপদ কারণ খুব কম মেয়েই আছে যারা এরকম প্রশংসা ভাল না বাসে। সে খুব সুন্দর করে হাসল– পরিষ্কার ঝর্নার মত।

‘এটা খুব ভাল যে আপনি বললেন আমার মুখটা ইন্টারেস্টিং কিন্তু আমি শুনতে শুনতে ক্লান্ত যে আমার মুখটা সুন্দর।’

আমি ভাবলাম, আচ্ছা বেশ তাহলে আপনার মুখটা সত্যিই সুন্দর! এবার একটু শব্দ করেই বললাম, ‘একটা ইন্টারেস্টিং মুখ কিন্তু সুন্দরও হতে পারে।’

‘আপনি তে বেশ সাহসী যুবক! কিন্তু এত সিরিয়াস কেন?’

তারপর ভাবলাম মেয়েটির জন্য আমার একটু হাসা উচিত। কিন্তু হাসির ভাবনাটা আরো সমস্যায় ফেলে দিল, আমাকে আরো নিঃসঙ্গ করে তুলল।

আমি বললাম, ‘আমরা খুব তাড়াতাড়ি আপনার স্টেশনে পৌছব।’

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার পথটা কম সময়ের। জানেন তো আমি আসলে দুই-তিন ঘণ্টার বেশি ট্রেনে বসে থাকতে পারি না।’

যদিও আমি রাজি ছিলাম আরো অনেক, অনেক সময় ওখানে বসে থাকতে, শুধুমাত্র তার কথা শোনার জন্য। তার গলার স্বরে পাহাড়ি ঝর্নার ঝিলিক ছিল। হয়তো যখনই সে এই কামরা ছেড়ে যাবে তারপরই ভুলে যাবে আমাদের এই ক্ষণিকের আলাপ-পরিচয়ের কথা; কিন্তু এটা আমার যাত্রাপথের সাথে সাথে যাবে হয়তো বা বেশ কিছু দিন।

ট্রেনটা ধীরে ধীরে প্লাটফর্মে প্রবেশ করল। বাইরে শোনা যাচ্ছে কুলির হাঁকডাক, দোকানদারদের হৈ চৈ আর একটা তীব্র মহিলাকণ্ঠ, হয়তো মেয়েটির কাকিমার।

‘এবার আসি,’ বলল মেয়েটি।

সে দাঁড়িয়ে ছিল আমার খুব কাছে। এত কাছে যে তার চুল থেকে একটা সুবাস আমার নাকে এসে লাগছিল। আমি হাতটা দিয়ে তার চুলটা একবার ছুঁয়ে নিতে চাইলাম কিন্তু মেয়েটি তখন এগিয়ে গেছে সামনে। শুধুমাত্র তার সুবাসটুকু এখনও বাতাসে লেগে আছে।

কামরা থেকে নামার দরজাতে কিছু চিৎকার চেঁচামেচি ঠেলাঠেলি শুনতে পেলাম। মনে হল ওঠার মুখে এক ভদ্রলোক যেন আমতা আমতা করে কারুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন। তারপর শব্দ করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আর বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আমি আমার বার্থে ফিরে এলাম। ট্রেনের গার্ড তার বাঁশি বাজাল আর আমরা আবার চলতে লাগলাম। আর একবার আমাকে খেলাটা খেলতে হবে, উল্টোদিকে নতুন একজন সহযাত্রীকে নিয়ে।

ট্রেনের গতি বাড়ল, চাকাগুলো তাদের ছন্দ ফিরে পেল। গাড়িটা গোঙাতে আর দুলতে লাগল। আমি জানালাটার সামনে বসে বাইরে দিনের আলোর পানে চেয়ে রইলাম যা আসলে আমার কাছে অন্ধকার। জানালার বাইরে কত কিছুই না ঘটে চলেছে! আসলে বাইরে কী ঘটে চলেছে তা অনুমান করাটা আমার কাছে বেশ মজার একটা খেলা।

যে মানুষটা কামরায় ঢুকেছেন তিনি আমার দিবাস্বপ্নটা ভেঙে দিলেন, ‘আপনি নিশ্চয় হতাশ হবেন, সহযাত্রী হিসেবে এইমাত্র যিনি চলে গেলেন আমি তার মত আকর্ষণীয় নই মোটেই।

‘সে বেশ ইন্টারেস্টিং ছিল। আপনি কি বলতে পারেন– মানে মেয়েটির চুলটা কি লম্বা না খাটো ছিল?’

ভদ্রলোকের গলাটা কেমন দ্বিধান্বিত শোনাল, ‘আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। আসলে আমি তার চোখ দুটো লক্ষ্য করছিলাম, তার চুলটা নয়। তার চোখদুটো খুব সুন্দর– কিন্তু মেয়েটির কাছে তার কোন দাম নেই। মেয়েটি পুরোপুরি অন্ধ। কেন, আপনি খেয়াল করেননি?’

অনুবাদ শুভঙ্কর সাহা

লেখক পরিচিতি

ভারতীয় (ব্রিটিশ বংশজাত) লেখক রাসকিন বন্ডের জন্ম ১৯৩৪ সালে। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সব রকম পাঠকের কাছেই তাঁর লেখা সমাদৃত। ১৯৯২ সালে লাভ করেন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার। ১৯৯৯-তে পান পদ্মশ্রী খেতাব। তাঁর বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে রয়েছে *আওয়ার ট্রিজ স্টিল গ্রোজ ইন দেহারা*। তাঁর *দি আইজ হ্যাভ ইট*-এর বঙ্গানুবাদ এখানে পত্রস্থ হল।

সুরাইয়া

সুরকাননের শুভ্র শেফালি

এমিলি জামান

‘ইউ হ্যাভ পুট লাইফ ইন দ্য সৌল অফ মির্জা গালিব।’ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সুরাইয়া-অভিনীত এবং সুরাইয়ার কণ্ঠসঙ্গীত-স্নাত *মির্জা গালিব* ছবিটি উপভোগ করে এমন স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন।

অভিনেত্রী সুরাইয়ার রীতিসিদ্ধ সাঙ্গীতিক প্রশিক্ষণ একেবারেই ছিল না। ‘গড গিফ্‌টেড’ বিশেষণটা তাঁর বেলায় দারুণ লাগসই। একজন সৌন্দর্যময়ী অভিনয়শিল্পী কণ্ঠসঙ্গীত দিয়ে অগণন সুরপ্রেমীর মন কেড়ে নিচ্ছেন, এটা সচরাচর ঘটে না। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী সুরাইয়ার সৌন্দর্য ছিল গীতিকবিতার মত অস্পষ্টতার মায়ায় জড়ানো। সৌন্দর্য, অভিনয়নৈপুণ্য আর অমূল্য কণ্ঠৈশ্বর্য দিয়ে জয় করেছিলেন একসময়ের মুম্বইয়ের চলচ্চিত্র জগৎ। তাঁকে ভূষিত করা হয় ‘মালিকা-ই-তারান্নুম’ উপাধিতে।

‘মুরলি ওয়ালে মুরলি বাজা...
সুন্ সুন্ মুরলি কো নাচে জিয়া...’

মুরলি (বাঁশি) কোথাও বাজুক না-বাজুক মধুকণ্ঠী সুরাইয়ার উল্লিখিত গানটি কানে প্রবেশ করামাত্রই গানপাগল শ্রোতার মন নেচে ওঠে। গানের বাণী সরল হলেও গায়ক-গায়িকার কণ্ঠপরশমণির ছোঁয়ায় স্বর্ণাভ হয়ে তা জয় করে নিতে পারে সহস্রকোটি সুরপিপাসুর হৃদয়। কণ্ঠশিল্পীর পারঙ্গমতা গানকে এমন এক ফর্মে ঢেলে সাজাতে পারে যে ‘গান শুনব’ এজাতীয় যান্ত্রিক সিদ্ধান্ত মাথায় নিয়ে গান শোনার জন্য প্রস্তুত হতে হয় না।

‘জহুরি জহর চেনে’ এই চলতি প্রবাদটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণিত করেন কণ্ঠসম্রাট কে এল সায়গল। গায়িকা সুরাইয়া মূলত সায়গলের আবিষ্কার। কণ্ঠসঙ্গীতে এই রমণীর অভাবনীয় সাফল্য অনেকটাই সায়গলের সস্নেহ সহযোগিতার ফসল।

তদবীর (১৯৪৫) সিনেমায় সুরাইয়া সায়গলের আগ্রহে নায়িকা নির্বাচিত হন। এরপর *ওমর খৈয়াম* আর *পারওয়ানায়* দু'জন মিলে উপহার দেন গুটিকয় প্রাণমাতানো গান। অভিনয়ও করেন একসঙ্গে। *পারওয়ানা* সুরাইয়াকে সঙ্গীত তারকার ঔজ্জ্বল্য উপহার দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায় সুবর্ণ আগামীর দ্বারপ্রান্তে। গানের ছবি *দিল্লাগী* (১৯৪৯), *বড়ি বহেন*, *পেয়ার কি জিত* (১৯৪৮) নায়িকা সুরাইয়াকে ছাপিয়ে গায়িকা সুরাইয়ার জয়গান গাইল। ‘মুরলি ওয়ালে মুরলি বাজা’, ‘তু মেরা চাঁদ ম্যায় তেরি চাঁদনি’ প্রভৃতি গান শুধু শ্রুতিনন্দন নয়– গানগুলো শুনলে প্রাণ-মন জুড়িয়ে যায়।

সুরাইয়ার পুরোনাম সুরাইয়া জামাল শেখ, যিনি আপন প্রতিভাবলে ‘ম্যাডাম সুরাইয়া’ নামে সম্বোধিত হতেন। ১৯২৯ সালের ১৫ জুন পঞ্জাব প্রদেশের গুজরানওয়ালায় তিনি পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলেন। তিনি ছিলেন মা-বাবার একমাত্র সন্তান। *আকাশবাণী*তে (রেডিও) ছোটদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে কিংবদন্তি রেডিও-ব্রডকাস্টার বাবা-ই-নাশাররাত জুলফিকার আলীর শিষ্যা হন তিনি। জীবনভ্রমণের সূত্র ধরে সুরাইয়া পঞ্জাব থেকে লাহোরে আসেন এবং মা দিদিমা মামা ও কাকার আগ্রহে অবশেষে মুম্বইয়ে থিতু হন। মুম্বইয়ের ফোর্ট জে বি পেটি গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী ছিলেন সুরাইয়া। ফারসি ভাষায় ইসলামিক শিক্ষাও পেয়েছিলেন পারিবারিক আবহে।

সুরাইয়াকে মিডিয়ার ঝলমলে অঙ্গনে নিয়ে আসেন তাঁর কাকা জহুর। ১৯৩৭ সালে *উসনে কিয়া সোচা* শো-র মাধ্যমে শিশু সুরাইয়ার পদযাত্রা শুরু। উৎসাহদাতা ও সহযোগী জহুর। সুরাইয়া যখন *আকাশবাণী*র শিশু সঙ্গীতশিল্পী, তখনই কো-আর্টিস্ট হিসেবে পরবর্তীকালের ফিল্ম-গুরু রাজকাপুর ও প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক মদনমোহনকে পেয়েছিলেন। স্কুলপড়ুয়া সুরাইয়া এক ছুটির দিনে জহুরকাকার সঙ্গে শুটিং দেখতে যান মোহন স্টুডিও-য়। *তাজমহল* ছবির শুটিং চলছিল। ছবির পরিচালক নানুভাই ভকিল খুব মনোযোগ দিয়ে সুরাইয়াকে লক্ষ্য করেন। তাঁর মনে হল, ছবিতে কিশোরী মমতাজমহল হিসেবে সুরাইয়াকে দারুণ মানাবে। সেই শুরু। তারপর শিল্পভ্রমণে এক এক করে সিঁড়ি ভাঙতে থাকেন সুরাইয়া। বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক নওশাদের সুর-সজ্জায় কার্দারের ছায়াছবি *শারদায়* প্লেব্যাক সিঙ্গার হয়ে আবির্ভূত হলেন। সালটা ১৯৪২। সুরাইয়ার সাঙ্গীতিক সাফল্যে নওশাদের অনেকখানি ভূমিকা ছিল। নওশাদ তাঁকে দিয়ে ৫১টি গান করান। ১৯৪৬ সালে *আনমোল ঘড়ি*, ১৯৪৭-এ *দর্দ*, ১৯৪৯-এ *দিল্লাগী* এবং ১৯৫০-এ *দাস্তান*। নওশাদের সুরবৈচিত্র্য আর সুরাইয়ার কণ্ঠৈশ্বর্য ভরিয়ে দেয় মুম্বই চলচ্চিত্র জগৎ। *তাজমহল* ছবিতে *প্রেম কি পিয়ারি নিশানি* হিন্দি গানটি সুরাইয়াকে দিয়ে সযত্নে পারফর্ম করান পরবর্তীকালের কিংবদন্তী সঙ্গীতকার এস ডি বর্মণ। নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীতশিল্পী সুরাইয়ার জীবনে আরো এক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত পরিচালক জুটি হুসনলাল-ভগতরাম। সুরাইয়াকে সঙ্গীততারকার দ্যুতি উপহার দেন মূলত নওশাদ ও হুসনলাল-ভগতরাম। ১৯৪২-এ সুরাইয়া *তামান্না* ছবিতে বিশিষ্ট গুণী সঙ্গীতশিল্পী মান্না দে-র সঙ্গে একটি গান করেন। দ্বৈতকণ্ঠের এই গানটি ছিল ‘জাগো আয়ি ঊষা’। মান্না দে-র সঙ্গীতশিল্পী পিতৃব্য কৃষ্ণচন্দ্র দে সম্পৃক্ত ছিলেন গানটির সুরসজ্জাকারী দলে। সাহিত্য ও ইতিহাসের আলোকে নির্মিত ছায়াছবি *মির্জা গালিব* সুধিজনের প্রশংসা কুড়োয় উচ্চাঙ্গের কাহিনি-বিন্যাস এবং সুরাইয়ার অভিনয় ও মর্মস্পর্শী গজলের জন্যে। রোমান্টিক সৌন্দর্যের অধিকারিণী সুরাইয়া প্রকৃতিগতভাবে ছিলেন খুবই রোমান্টিক। অভিনেতা গ্রেগরি পেকের দারুণ ফ্যান ছিলেন তিনি। বলিউড অভিনেতা দেবানন্দের চেহারায় গ্রেগরি পেকের ছাপ ছিল। দেব লিরিক্যাল বিউটি সুরাইয়াকে ভালবেসেছিলেন। পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুরাইয়ার অনামিকায় পরিয়ে দেন তখনকার তিন হাজার টাকা দামের হীরের আংটি। দিদিমা বাদশাহ বেগম সেই আংটি সুরাইয়ার আঙুল থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেন। প্রেমাবেগ সুরাইয়ার ক্যারিয়ারের পরিপন্থী হবে আর দেব জাতিতে হিন্দু– এই ছিল বাধা। একনিষ্ঠা সুরাইয়া চিরকুমারী রয়ে যান। দেব ছাড়া আর কাউকে তিনি হৃদয়ে ঠাঁই দিতে পারেননি। মুম্বই মেরিন ড্রাইভের ‘কৃষ্ণামহল’-এ একাকী বাস করতেন এই অভিমানিনী অভিনেত্রী। ২০০৪ সালের ৩১ জানুয়ারি তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। বয়স হয়েছিল ৭৪। মালিকা-ই-তারান্নুমকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে ভারতীয় ডাকবিভাগ তাঁর মুখচ্ছবি অঙ্কিত ডাকটিকেট রিলিজ করে। দৈহিক মৃত্যু মালিকা-ই-তারান্নুমকে সুরপ্রেমী সহস্র কোটি মানুষের মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি– আজো তিনি অগণন শ্রোতা-দর্শকের অন্তর-সিংহাসন দখল করে আছেন।

এমিলি জামান সংস্কৃতিকর্মী

জলপাই সুখ

নুসরাত নুসিন

গাঢ় লিপস্টিকের ছোঁয়ায় অবনত মায়া ঝুলে আছে।
সন্ধ্যা ছাড়িয়ে যায় গভীর আঁধার। তখনো হাতের মাঝে বৃত্ত আদর,
আদরের ভাঁজে ভাঁজে নীরব নিথর থাকে জলপাই সুখ।
চোখের পাতায় আঁকা আগামীর এক্সরে। মাঝে মাঝে বিনয়ী হয় ক্ষণকাল।
তারপরও আমাদের রাজপথ রাত নিয়েই ছুটে চলে। রাজপথ হাত তোলে।
স্লোগানে স্লোগানে আসে নতুন দুপুর।
মুড়িভাজা ভোর থেকে খই ভাজা গোধূলি
প্রতিটি পর্ব থাকে চঞ্চল মায়ায়,
তখনো শিশির থাকে তখনো শিশির আঁকে
নিমগ্ন আনাড়ি আনকোরা ছায়ায়...

নিষিদ্ধ নগর

অমিতাভ মীর

কতদিন আমি পা রাখিনি–
চন্দনার তীরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা,
ঐ নিষিদ্ধ নগরীর তোরণদ্বারে।
একদিন যেখানে প্রতিটি চন্দ্রিকায়–
চন্দ্রচূড়ের বেশে তোমার সাথে,
অবগাহন করতাম চন্দ্রিমা-সরোবরে;
কতদিন আমি পা রাখিনি ঐ নিষিদ্ধ নগরে।
যদিও ঐ নগরীতে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ,
তবু আমি জানি– প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ–
তোমার নগরীর ঐ সুউচ্চ তোরণদ্বার,
প্রতীক্ষায় থাকে শুধু আমার।
চন্দ্রিকা যে চন্দ্রচূড়ের সাথে চন্দ্রিমায়
ভিজতে চায়– সে কি তুমি জান না!
আমি একদিন ঠিক যাব–
পা রাখব ঐ নিষিদ্ধ নগরীর তোরণদ্বারে,
চন্দনার বুকে চেপে থাকা কুয়াশার চাদর;
এক ঝটকায় সরিয়ে দেব।
তারপর, তোমার অন্দর মহলের
সবগুলো পর্দা এক এক করে সরিয়ে দেব,
রাজ্যের যত আলো সেখানে এনে ফেলব;
সে আলোয় তোমাকে দেখব নতুন করে!
তুমি ঠিক দেখে নিও–
আমি আবার পা রাখব ঐ নিষিদ্ধ নগরে।

আমার ভোরগুচ্ছ

সোহরাব পাশা

তোমাকে ভাবলেই বিসমিল্লা খাঁর সানাই বাজে
বুকে, তাই মাতাল করে না আর কোন সুরধ্বনি
আমার সকল ভোরবেলা,

গোধূলি ফিরিয়ে দেয় পাখির গন্তব্য– স্বপ্নগৃহ,
আমার গন্তব্যে ছিলে শুধু তুমি চিরবসন্তের
বাসনায়;

কখনো কী খুঁজেছিলে হারানো দুপুর– বিস্মৃতির
ভাঙা আয়নায়? ধীরে রোদ নিভে আসা পৃথিবীর
অজস্র বিকেলে মেঘ জমে ছিল বিষণ্ন সন্ধ্যার,
তোমার সকল সমর্পণ ছিল রাত্রির প্রভাতে;

এখন প্রভাতগুলো খোলা মাঠে মুখ ঢেকে যায়
ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াশায়,
তোমাকে দেখি না আর হারিয়ে যাওয়ার
সেই আধো আলো-ছায়া নীল জানালায়

বর্ষা ও বসন্ত

নাসিরুদ্দীন তুসী

বর্ষা ও বসন্ত, একসাথে ভালবাসি দুজনকে!

যখন বর্ষার কাছে যাই মনে পড়ে বসন্তকে,
যখন বসন্তের কাছে যাই মনে পড়ে বর্ষাকে।
আমি বর্ষায় লিখি বসন্তকে প্রেমপত্র
বসন্তে লিখি বর্ষাকে নিয়ে কবিতা।

অভিমানিনী বর্ষা আমাকে ভোলাতে চায়
সে আসে মৃদুমন্দ কদমে, ভেজা কদমের গুচ্ছ হাতে।
ক্রন্দনশীলা বর্ষার দুচোখে জলের ধারা
কালোমেঘে এলোকেশী সে, নূপুরপরা নৃত্যপটীয়সী।
রবিশঙ্করের সেতারের মত প্রিয়ংবদা বর্ষা
আমাকে আচ্ছন্ন, ব্যাকুল করে।
কিন্তু কী আশ্চর্য!
আমি বর্ষার কোলে শুয়ে
বসন্তকে লিখি প্রেমপত্র।

লাস্যময়ী বসন্ত আমাকে উচ্ছ্বাসে ভাসায়
সে আসে বর্ণ ও গন্ধের বিপুল সম্ভার নিয়ে।
গলায় পরে বিচিত্র ফুলের মালা
তা-তা-থৈ নৃত্যে সে হাসে, নাচে এবং আমাকে ও...।
অনিন্দ্যসুন্দরী বসন্তের প্রেমমদিরা পান করতে করতে
আমার মনে পড়ে আবেগময়ী শ্যামাঙ্গিনী বর্ষাকে
তাই বসন্তের ফুলশয্যায় লিখি বর্ষাকে নিয়ে কবিতা।

বর্ষা ও বসন্ত, একসাথে ভালবাসি দুজনকে!

বিপ্রতীপ

এস এম তিতুমীর

বোতাম খোলা মাটির বুকে আকাশ
নেমেছে বৃষ্টির সুতোয়
খুব ভিজেছি আমি; নিমগ্ন ধারায়
পড়েছি আমার জন্মকাব্য
শাল-জারুলের পাতায় পাতায়
পাখিরা পালক খুলেছে
আলোক এসেছে যখন
আশ্রয়ী শৈশব ভিতে

উঠেছে পাঁচিল সাদাকালোয়
লতাদের আলিঙ্গনে
গিলে খেলে চাঁদ চকোরির জল
স্মৃতিরা দাঁড়ায়; আমারই বিপরীতে

শ্বেতকরবী

গোলাম কিবরিয়া পিনু

একরোখা হয়ে–
বিরুদ্ধ বাতাস ঠেলে নিয়ে
–তোমাকে ছুঁয়েছি!
প্রতিতুলনা চলে না– অন্য কেউ এখন জ্বলে না
এই চোখে। অদ্ভুত আবেশ।
সংযম ছিঁড়ে যায়– প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণায়
দুমড়িয়ে-মুচড়িয়ে আমি
একটানা চলি দীর্ঘপথ। রথ খুঁজে–
পাই অবশেষে।
দৃশ্যপরম্পরা– কত দৃশ্য নিয়ে তুমি
দৃশ্যমান হয়ে ওঠ– আমারই কাছে
ও শ্বেতকরবী–
আজ তুমি ফুটেছ বন্যভূমির গাছে!

ধূলিখাম

তুষার কবির

তোমাকে লিখেছি কিছু ধূলিখাম চিঠি যার ভাঁজ খুলে
বের হয় সরোদের সুর, রতির পালক আর ঘুমলাগা মেঘের ঘুঙুর।
চিঠিগুলোর ভেতর কোন ভগ্নগাথা নেই; যেখানে শুধু
লিখে উঠতে চেয়েছি পুরনো তোরঙ্গে জমা কিছু
দুঃখস্বর– ব্যথা, আর্তি, মোহ, মায়া, ভ্রম– যা কিছু
হারিয়ে যাচ্ছে নভোনীলে তার টুকরো টুকরো সারাৎসার
খুঁড়ে বাজাতে চেয়েছি শুধু মাঝরাতে জাদুর ভৈরবী!
তোমার আঙুলগুলো কি ছুঁতে পারে সেই লুপ্তচিহ্ন–
দাহগাথা– রক্তস্বর? শব্দগুলো হাতড়ে বেড়িয়ে তোমার
আঙুলগুলো কি বাজাতে পারে চকমকি রঙিন পাথর,
প্রাচীরের শিলালিপি, প্রান্তরের জীবাশ্ম প্রস্তর?

বৃষ্টি

রঞ্জনা রায়

শরীর জুড়ে বৃষ্টিফোঁটা খেলা করে
যেন চেতনার কাচঘরে গহন রূপকথা।
রোমকূপে জন্ম নেয় সজল শ্যামল আষাঢ়
ভিজে যাই
ভিজে যায় তপ্ত মিলনক্ষণ।

নিবিড় বৃষ্টি উৎসবে ঘুমভাঙা সবুজ পাতায়
সৃষ্টি শিহরন,
অসীম বন্যতা।
সব কথা আজ বৃষ্টি ছন্দে
নীলাভ সাগর মোহনায়।

মেঘের চিঠি উড়ন্ত বকের ডানায়
যক্ষিণীমন অনন্ত প্রতীক্ষায়।

রঞ্জনা রায়
ভারতের কবি

লোকে বলে

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

লোকে যাকে ভালবাসা বলে, তুমি জানো, এর মানে
ভিতরে অনেক আছে ফাটল আর ফাটলের গায়ে
পুরনো গাছের মত মরা ডাল, শিকড়ের লোভ,
রোদ নেই, ভিজে ছাল, গান গায় কাঠের পোকারা–

যতখানি ভেবেছিলে তত নয়, সোজা নয়, সোজা
হাত থেকে ছুটে যায় পালকের মত চিঠি, সরু
ছোট ছোট অক্ষর, চিকন কালিতে লেখা, ভাল–
বাসা অত সোজা নয়, লোকে যাকে বলে জানি আমি
এই তো সেদিন, যেন কতকাল আগে দেখা হল!
ঠোঁট থেকে ঝরে যায় চামড়ার রোদ, দেখে দেখে
অথবা দেখিনি জেনে, আরো কেউ, কেন কেউ? রাগ
প্রথম শীতের রাত– শীতের কামড়, ভুল বাস
ভুলে গিয়ে যারা যারা ঠিকঠাক ফিরে এসেছিল
তারা জানে, কাকে বলে বেঁচে থাকা, আসলে জানে না
ভীষণ সহজ তবু ঠিক কিছু ভুল প্ররোচনা
যে কথার মানে নেই, যে নদীর জল মরে গেছে
যে পাহাড়ে কোনদিন আর কেউ উঠবে না জেনে
সেই কথা, সেই নদী, সে পাহাড়, দেখে এসে জানি
লোকে যেটা বলে সেটা কতখানি জান না তুমিও!

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়
ভারতের কবি

শিশুতীর্থ

বিগফুট কি সত্যিই আছে?

নাসরীন মুস্তাফা

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

ইয়েতির মাথার খুলি

খুমজুং গ্রামটা মোটেও অজ পাড়াগাঁ নয়। আধুনিক সুযোগ সুবিধা ভালই আছে। হোটেলে গরম পানিতে গোসল করে পেট ভরে খেলাম। আপেল পাই পর্যন্ত পাওয়া গেল। গাদা গাদা মাখন গলানো মগে কফি, তাতে আমিও একটু চুমুক দিয়েছি। ঠাণ্ডা কাটবে, আম্মু তা-ই বলেছিলেন।

নিশাত আন্টি মোবাইল চার্জ দিচ্ছিলেন। বললেন, এ রকম জায়গায় বিদ্যুৎ সুবিধা পাব, এ আমি ভাবিনি।

হাশেম আংকেল ল্যাপটপ খুলে বসেছেন। বললেন, সোলার এনার্জিকে কাজে লাগাচ্ছে এরা। লেখাপড়া খুব একটা জানে না। তবে বিদেশি পর্যটকদের সুবিধার জন্য সোলার লাগিয়েছে। আপেল পাই বানাতে শিখেছে।

আম্মু বললেন, গরম পানি কল দিয়ে এল। এর ব্যবস্থা ওরা কিভাবে করেছে, দেখে তো আমি অবাক।

আমি আর বুনু প্রশ্ন করলাম, কিভাবে করেছে?

রান্নার চুলার ভেতর দিয়ে পাইপটা টেনে নিয়ে গেছে গোছলখানায়। চুলার গরমে পাইপের ভেতরকার পানি গরম হয়ে যাচ্ছে। সহজ বুদ্ধি। তবে দারুন।

খুব বেশি মানুষ নেই এখানে। হাশেম আংকেল জানালেন, হাজার দুয়েক মানুষের বাস। সেই ১৯৬১ সালে এখানে একটি স্কুল খুলে দেন স্যার এডমন্ড হিলারির প্রতিষ্ঠিত হিমালয়ান ট্রাস্ট। তখন মাত্র দুইটা ক্লাসরুম থাকলেও এখন নাকি তিনশোর বেশি ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করছে। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাও দেওয়া যায় এখান থেকে।

একটু পরেই রওনা হব। বুনুর ঠাণ্ডা লেগে গেছে। গরম পানিতে গার্গল করছে বলে আমরা অপেক্ষা করছি। সবাই মিলে আশ্রমে যাব আজ। ইয়েতির মাথার খুলি দেখব। আমার বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করছে সেই কখন থেকে।

আম্মুর মুখ শুকিয়ে গেছে। বুনুর গলা ব্যথা হলেই টনসিল পেকে যায়, ইনফেকশন হয়ে যায়। চিন্তায় পড়ে যান আম্মু। এখনও তাই হল। মুখ দেখেই বুঝছি, চিন্তায় আছেন। বিরক্তি নিয়ে বললেন, আমি এই জন্যই ঘর থেকে বেরুতে চাই না। ইয়েতি ইয়েতি বলে মাথাটা খারাপ করে ফেলেছিল। হাশেম ভাই বললেন, ঘুমজুংয়ে ইয়েতির মাথার খুলি আছে, তাই দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। এখন যা রাগ হচ্ছে না! ইয়েতির কথা প্রথম কে জানিয়েছিল, রাগটা তার উপরও হচ্ছে।

নিশাত আন্টি হেসে দিলেন আম্মুর কথা শুনে। হাশেম আংকেল বললেন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল চার্লস হাওয়ার্ড বারি হচ্ছেন সেই তিনি, যিনি প্রথমে ইয়েতির পায়ের ছাপ দেখেছিলেন বলে ভেবেছিলেন। তাঁর লেখা থেকে ইয়েতির নাম পাওয়া যায় সবচেয়ে প্রথম। আপনি তার ওপর রেগে যাবেন জানলে নিশ্চয় ওরকম ভুল করতেন না।

আম্মুও হেসে দিলেন। আমি লাফিয়ে চলে এলাম হাশেম আংকেলের কাছে। তিনি বললেন, ১৯২১ সালে ব্রিটিশ অভিযাত্রীদলের হয়ে তিনি এসেছিলেন এভারেস্ট পর্বতে। এই অভিযাত্রার স্মৃতি বর্ণনা করে একটা বইও লিখেছিলেন– *মাউন্ট এভারেস্ট দ্য রিকন্নেইসান্স*। ২১ হাজার ফুট উপরে লাকপা লা নামের জায়গা পার হতে গিয়ে তিনি বরফের উপর বিশাল একটি পায়ের পাতার ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ধূসর নেকড়ে লাফিয়ে যেতে গিয়ে বরফের উপর পিছলে পায়ের পাতার দ্বিগুণ বড় সাইজের ছাপ ফেলে দিয়েছিল। পাত্তা না দিয়ে এগুতে যাবেন, তখন তার সঙ্গের শেরপারা জানাল, এই ছাপ অবশ্যই 'বরফের বুনা মানুষ'-এর। শেরপাদের ভাষায় সেই মানুষটার নাম 'মেতোহ্-কাংমি'। 'মেতোহ্' মানে মানুষ-ভল্লুক, আর 'কাং-মি' হচ্ছে বরফ মানুষ বা হিম মানব।

এতেও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। শেরপাদের কথায় মেনে নিতে হবে, ওটা ইয়েতির পায়ের ছাপ ছিল?

আম্মুর এরকম প্রশ্ন শুনে আমি বলি, ওটা ইয়েতির পায়ের ছাপও তো হতে পারে। ধূসর নেকড়ে তো না-ও হতে পারে।

হাশেম আংকেল মাথা নাড়লেন। বললেন, তোমার কথা সত্যি হতেও পারে। জান, কলকাতার *দ্য স্টেইটসম্যান* পত্রিকার এক সাংবাদিক হেনরি নিউম্যান সেই সময় হাওয়ার্ড বারি-র দলের সঙ্গে থাকা শেরপাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ওরা ইয়েতির পায়ের ছাপ বলেই সাক্ষ্য দিয়েছিল।

আম্মু গোঁ ধরে আগের মতই বললেন, শেরপাদের সাক্ষ্য না মানলে ওটা কিন্তু ইয়েতি ছিল না। আমি তো শুনেছি, বেশ কিছু হিমালয়ের অধিবাসী লেপচা গোত্রের মাঝে সেই গৌতম বুদ্ধেরও আগেকার সময় থেকে শিকারের দেবতাকে পূজা করার রীতি চালু আছে। এই দেবতা দেখতে বানরের মত, হাতে পাথর। ঐ এলাকায় তো বটেই, নেপাল-ভারত-বাংলাদেশে বানরের কি অভাব আছে? দেবতা বলে সেই বানরটা বড় আকারের। দেখতে দেখতে ওটাই হয়তো ইয়েতির গল্প ছড়িয়েছে।

হাশেম আংকেল মাথা নাড়ছেন। এর অর্থ, হতেও পারে। ১৮৩২ সালে *জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল*-এ অভিযাত্রী বি এইচ হজসনের বর্ণনা ছাপা হয়েছিল। নেপালের উত্তরাংশে তিনি এক বিশাল লম্বা, কাল লম্বা চুলে ঢাকা দু'পেয়ে জন্তুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। বিপদ ঘটেনি, কেন-না জন্তুটা ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। হজসনের মতে, ওটা একটা ওরাংওটাং। ১৮৯৯ সালে লরেন্স ওয়াডেল-এর লেখা *এমং দ্য হিমালয়ানস* বই থেকে তিনি বরফের উপর পায়ের পাতার বিশাল আকারের ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর ধারণা হয়েছিল, ওটা একটা ভল্লুকের পায়ের ছাপ। ইয়েতি সম্বন্ধে কানাঘুঁষা শোনেননি তা নয়, তবে তিনি স্পষ্ট লিখেছিলেন, 'বহু তিব্বতীকে জেরা করেও খুব গ্রহণযোগ্য কোন ঘটনা পাইনি।' সবাই খালি বলে, আমি অমুকের কাছ থেকে শুনেছি যে অমুক দেখেছে। এরকম কথা দিয়ে তো আর ইয়েতি আছে, তা প্রমাণ করা যায় না।

ঠিক। আম্মু খুব জোর দিয়ে বললেন।

স্থানীয়দের মত ইয়েতি দেখার ভূত পেয়েছিল ইউরোপিয়ানদেরও। বিশ শতকের অভিযাত্রীদের অনেকে এভারেস্ট থেকে ফিরে নিজের দেশে গিয়ে বলতেন, অদ্ভুতুড়ে প্রাণীকে দূর থেকে দেখেছেন, বরফের উপর খুঁজে পেয়েছেন আজব পায়ের ছাপ। ১৯৫১ সালে এভারেস্ট পর্বতের উচ্চতা মাপামাপির কাজ শুরু হলে এরিক শিপটন ২০ হাজার ফুট উচ্চতায় বরফের উপর পাওয়া পায়ের ছাপের ছবি তোলেন। এ নিয়েও বিতর্ক হল। কেউ বললেন, এগুলো ইয়েতির পায়ের ছাপ। কেউ কেউ বললেন, বরফের কারণে হারিয়ে যাওয়া এভারেস্টের কোন অজানা প্রাণী হয়তো ছাপ রেখে গেছে। এর দুই বছর পর, ১৯৫৩ সালে তো স্যার হিলারি আর তেনজিং এভারেস্ট জয় করলেন। পায়ের ছাপ তো তাঁরাও দেখেছিলেন। তনজিং নরগে শেরপা তাঁর লেখা প্রথম আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন ইয়েতি বড়সড় বনমানুষ। তিনি নিজে একে না দেখলেও তাঁর বাবা নাকি দুই দুইবার দেখেছিলেন। তবে দ্বিতীয় আত্মজীবনীতে ইয়েতি আছে কি না, এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি।

আম্মুর মুখের হাসিটা আরো চওড়া হল।

হাশেম আংকেল বললেন, ১৯৫৪ সালের ১৯ মার্চ *ডেইলি মেইল* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে জানা গেল, পাংবোচে মঠে (ঘুমজুং আশ্রমের আরেক নাম) রাখা ইয়েতির মাথার খুলি থেকে চুল নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। চুলগুলো অল্প আলোতে কাল আর বাদামী রঙের হলেও সূর্যের আলোয় গনগনে লাল। শারীরবিদ্যা বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ফ্রেডারিক উড জোন্স চুলগুলো নিয়ে নানান পরীক্ষা করে বললেন, এগুলো ভল্লুক কিংবা কোন বনমানুষের নয়। তবে চুলগুলো কার, তা নিশ্চিত হতে পারলেন না প্রফেসর।

এরপর?

২৩ ডিসেম্বর ১৯৬০। স্যার হিলারি আর বিজ্ঞানী ডেসমন্ড দইগ ইয়েতির সন্ধানে হিমালয়ে অভিযান করছিলেন। পাহাড়ে ইয়েতি পেলেন না, ইয়েতির মাথার খুলি পেলেন এখানে এসে। খুলিটা তখন কার কাছে ছিল, জান?

গ্রামের সবাই এক বুড়িকে বলত ডাইনি। তার ঘরের টেবিলের ওপর রাখা ছিল এটি। ডাইনি বুড়ি এই খুলি নিয়ে জাদু করত। স্যার এডমন্ড হিলারি খুলিটাকে ব্রিটেনে নিয়ে যেতে চাইলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখতে চাচ্ছিলেন, সত্যিই এটি ইয়েতির মাথার খুলি কি না। বুড়ি তো কিছুতেই দেবে না। তার বিশ্বাস, এই খুলি গ্রামে না থাকলে গ্রামের ওপর শয়তানের আছর পড়বে। তিনটি শর্তে খুলি পাওয়া গেল। মোটা অংকের অর্থ সাহায্য দিতে হল খুমজুং আশ্রমে। খুলির জিম্মাদার হিসেবে খুমজুং গ্রামের প্রধান খুমজু চুম্বিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর খুলি নিয়ে গ্রামে ফিরে যাবেন খুমজু। আর খুমজুং গ্রামে একটি স্কুল তৈরি করে দিতে হবে। তিনটি শর্ত মেনে গ্রামের প্রধান খুমজু চুম্বিকে সঙ্গে নিয়ে স্যার হিলারি আর বিজ্ঞানী ডেসমন্ড দইগ খুলি হাতে করে ব্রিটেনে ফিরে গেলেন।

হাশেম আংকেল কিছুক্ষণ থেমে থেকে বললেন, ব্রিটিশ, ফরাসি আর আমেরিকান বিজ্ঞানীরা নেমে পড়লেন খুলি আর খুলিতে লেগে থাকা চুল পরীক্ষার কাজে। স্যার হিলারি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে এটা ইয়েতির খুলি, ততক্ষণ তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না যে ইয়েতি আছে। খুমজু চুম্বি যদিও বিদেশিদের সামনে বার বার বলছিলেন, তিনি দিনের মধ্যে তিন বার ইয়েতি দেখেন আর তার ছেলেপুলেরা দেখে একটা করে। সাদা চামড়ার মানুষগুলোর অবিশ্বাসের ঘটা দেখে খুমজু চুম্বি বলেছিলেন, নেপালে জিরাফ বা সিংহ আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি না, কেন-না ওগুলো ওখানে নেই। তেমনি তোমরা ইয়েতিকে বিশ্বাস করছ না, কেন-না ইয়েতি তোমাদের এখানে নেই।

খুমজু চুম্বির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ইয়েতি কিভাবে ডাকে? নিচু গলায় কান্নার ভঙ্গিতে খুমজু দেখালেন সেটা। বললেন, তার ছেলেমেয়েরা ইয়েতিকে ডাকলে ইয়েতি নাকি দৌড়ে পালিয়ে যায়। খুমজু চুম্বির ভাষায়, মানুষের মত মাথা আর কুকুরের মত দৌড়নোর শক্তি আছে ইয়েতির। আর আকার দশ বছর বয়সী শিশুর সমান।

টেবিলের ওপর রাখা ইয়েতির মাথার খুলির বয়স জানা গেল ২৪০ বছর।

আর কি জানা গেল? আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলাম।

পরীক্ষার ফলাফল ইয়েতির পক্ষে যায়নি। বলা হল, এটা বোধহয় বড়সড় পাহাড়ি ছাগল (নেপালি ভাষায় চ্যাংড়া)-এর মুণ্ডু।

আম্মু ভাবছিলেন, আমি বোধহয় খুমজুং আশ্রমে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি। মুন্নি আপু বার বার চ্যাংড়া চ্যাংড়া বলে খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসছিল। বুনু খুব রাগ করে ধমক দিল মুন্নি আপুকে। ওর গলা ব্যথা বলে বেশি কথা বলতে পারছিল না। আর বললেও কি কাজ হত? মুন্নি আপু মজা করতেই মজা পাচ্ছিল। নিশাত আন্টির ধমকেও থামতে চাইছিল না। শেষে হাশেম আংকেল যখন বললেন, মুন্নি আপুকে ছাড়াই আমরা খুমজুং আশ্রমে যাব, তখন ও চুপ করল।

জিপে উঠে বসলাম আমরা। কপাল ভাল, আজ সূর্যটা ভালই আলো ছড়াচ্ছে। হালকা হালকা ওম আমাদের আরাম দিচ্ছিল। বুনু ভাল করে মাফলার দিয়ে গলা ঢেকে, কানঢাকা লোমশ টুপি পরে বসেছে। বসা গলায় বলল, আমাকে কি দেখতে ইয়েতির মত লাগছে?

মুন্নি আপু এতক্ষণ ধমক খেয়ে চুপ করে ছিল। এবার হা হা করে হেসে উঠল। আমিও হাসলাম। এরপর বুনু বলল, আমি ইয়েতি। আমি এখন মুন্নিকে হাম্ করে খেয়ে ফেলব।

এবার আমি খুব মজা পেলাম। হা হা করে হেসে দিলাম।

খুমজুংয়ের বাতাস পাতলা। নিশাত আন্টি কথাটা বলেই হাসলেন। এখন এভারেস্ট পর্বত জয়ের সময় নয়, এপ্রিল-মে-জুন মাসে সময়টা আসে। তখন দলে দলে নানান দেশের অভিযাত্রীরা এই পথ ধরেই উঠে যান পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গাটায় পা রাখার লোভে। ছোট ছোট ঘরবাড়ির পাথরের দেয়াল, জুনিপার বেরির ঝাড়, উঠানে ইয়াক নামের এক ধরনের পাহাড়ি ষাঁড়ের ন্যাদা (মল) প্লাস্টিকের চাদরের উপর গোল গোল রুটির মত বেলে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বাতাসে এই মল শুকানোর গন্ধ। এগুলো রান্নার চুলায় জ্বালানি হিসেবে পোড়ায় এরা।

খুমজুং গোম্বা চোখে পড়তেই হাশেম আংকেল বললেন, ঐ যে। ঐখানেই ইয়েতির মাথার খুলি রাখা আছে। ঐ তো সেই আশ্রমটা।

জিপ থামিয়ে পাহাড় ভাঙার মত করে উপরে উঠে গেলাম আমরা। আমার বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছে। পর্যটক দেখে এগিয়ে আসছে কয়েকজন তিব্বতী, বয়স বোঝা যায় না এমন চেহারা এদের। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছিল দু'জন। আধ-খেঁচড়া ইংরেজিতে বক বক করছে, আমাদের ইয়েতির খুলি সংক্রান্ত তথ্য জানাতে চাইছে। ওরা যা বলছিল, তার অনেক কিছুই আমাদের জানা। এরপরও হাশেম আংকেল এদের একজনকে থামিয়ে আরেকজনকে বললেন আমাদের সঙ্গে আসতে। এ আমাদের গাইড। নাম জিগ্যেস করতে বলল, কুসাং।

দুই হাত বাতাসে ছড়িয়ে কথা বলে কুসাং। ইয়েতির খুলি নিয়ে অনেক উত্তেজনাময় কথা। একটা ইয়েতি নাকি নেমে এসেছিল। তখন খুমজুং-এর এক সাহসী মানুষ ইয়েতিটাকে খালি হাতে মেরে ফেলেছিল। ইয়েতির খুলিটা কেটে নিয়ে রেখে দেওয়া হয়।

হাশেম আংকেল বাংলায় বললেন, এক বিন্দু বিশ্বাস কোরো না এর কথা। যতসব গপ্প শোনাচ্ছে।

তাহলে?

আসল সত্য তো অন্য। বেশ কয়েক প্রজন্ম আগেকার কথা। খুমজুং-এর মানুষরা প্রতিবেশি গ্রামগুলোর বাসিন্দাদের জন্য একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনেকেই নানান উপহার নিয়ে এসেছিল। থেম গ্রাম থেকে আসা অতিথিরা এনেছিল এই ইয়েতির খুলিটা। খুব রেগে গিয়েছিল খুমজুং-এর মানুষরা। একেবারে লাথি মেরে মেরে থেম গ্রাম পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওদের। তারপর বলেছিল, যা ব্যাটা, ভাগ! আর কোন দিন খুমজুংমুখো হবি না। অবহেলায় ফেলে রাখা ছিল খুলিটা। কিন্তু কিভাবে কিভাবে যেন সাদা চামড়ার মানুষরা খবর পেয়ে এ গ্রামে আসতে শুরু করল। স্যার এডমন্ড হিলারি আসার পর তো একেবারে নড়ে চড়ে বসল গ্রামের মানুষ। খুলিটা তখন এদের কাছে দারুন দামি। স্যার হিলারি খুলিটাকে নিয়ে যেতে চাইলে ওরা তিনটি শর্ত দিয়েছিল। সে কথা অবশ্য আমি আগেই শুনেছিলাম।

খুমজুং গোম্বা তিব্বতী বৌদ্ধদের আশ্রম বা মঠ। এরা খুব অতিথি পরায়ণ। নিজেদের রীতি অনুযায়ী আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। তিব্বতী উত্তরীয় গলায় ঝুলিয়ে দিল আমাদের। একজন ভিক্ষু নিয়ে গেলেন সবুজ একটি স্টিলের কেবিনেটের সামনে। ইংরেজিতে বললেন, হিয়ার ইজ দ্য ইয়েতি স্কাল্প।

কোথায়? কোথায়? আমি দেখব।

কেবিনেটের ভেতরে একটা তালামারা বাক্সের ভেতর রাখা খুলিটা। সামনের দিকে কাচ দেওয়া। ভাল করে দেখা যায় না। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখি। পারলাম না। যেটুকু দেখলাম, তাতে মনে হল খুলির গায়ে সেঁটে থাকা চুলগুলো লালচে।

বুনু কুসাংয়ের কাছে জানতে চাইল, ইজ ইট রিয়্যাল?

কুসাং মিষ্টি করে হাসল। ছোট বাচ্চার সামনে কি বলবে কি বলবে না, তা নিয়ে খানিকটা সময় ভাবল বলে মনে হল। তারপর বলল, আমি ঠিক জানি না। না না, ইয়েতি আছে সেটা জানি। তবে এটা ইয়েতির খুলি কি না, সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। ইয়েতি আছে, কোথাও না কোথাও আছে ঠিক ঠিক। আমি দেখিনি। কিন্তু আমার বুড়ো বাপ দেখেছিল।

বিগফুট

সেবার আমাদের ইয়েতি অভিযান শেষ হয়েছিল বুনুর অনেক জ্বর আসার মধ্য দিয়ে। আম্মু মুখ শুকনো করে ওকে জড়িয়ে ধরে বসে ছিলেন। পাহাড়ি রাস্তায় আমাদের গাড়িটা যেন ছুটছিল। বাইরের দিকে তাকালে বুক শুকিয়ে আসত। রাস্তার একদিকে খাড়া পাহাড় আর আরেকদিকে গভীর খাদ নেমে গেছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই গাড়িটা পড়ে যাবে হাজার ফুট নিচে। এর মধ্য দিয়েই গাড়ি ছুটছিল। আম্মু ড্রাইভার আংকেলকে বলেছিলেন, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, হাসপাতালে যেতে হবে।

এর পরের বছর নেপাল থেকে চলে এলাম আমরা। আম্মু ঢাকায় বদলি হয়েছেন। আমরা আবার চারজনের সংসার হলাম। এত দিন ঢাকায় থাকা আব্বুকে পাইনি, এখন পেলাম, আব্বুও আমাদের পেলেন। নতুন স্কুলে ভর্তি হলাম। নতুন বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে মনে পড়ে অনুছা আর নিছার কথা।

ইয়েতি আর ছিল না মাথার ভেতর। কেবল মাঝে মাঝে, গভীর রাতে যখন ঘুম আসত না, মনে হত ইয়েতির কথা। সাদা বরফের পাহাড়ে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে ইয়েতি। মাঝে মাঝে রাতের আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠছে। ওর খুব মন খারাপ, বুঝতে পারি। একা থাকতে ওর ভাল লাগে না, টের পাই। আমি তখন আবার পুরনো দিনের মত বলতে থাকি, বড় হয়ে আমি যাব তোমার দেশে। তখন আর তোমাকে একা থাকতে হবে না। আমি তোমাকে নিয়ে আসব। আমাদের চারজনের সংসারে থাকবে তুমি। দেখ, কত্ত মজা হবে তখন!

আব্বুর সাথে মাঝে মাঝে নেপালের দিনগুলোর গল্প হত। আব্বুকে ইয়েতির কথা বলতে চেয়েছি, কিন্তু আব্বুর একটাই কথা, ঐ দিনের কথা বল মা। ঐ যে তুমি আমার জন্য কেঁদেছিলে।

সে আরেক গল্প।

আমাদের নানা গিয়েছিলেন নেপালে আমাদের কাছে। নানার খুব ইচ্ছে লুম্বিনি যাবেন। গৌতম বুদ্ধ জন্ম নিয়েছিলেন লুম্বিনিতে, তাঁর স্মৃতিময়

স্থানগুলো দেখবেন। আমি, বুনু, আম্মু আর নানা গেলাম লুম্বিনিতে। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবস্তুতে গেছি, ওখানে গৌতম বুদ্ধের বাবা রাজা শুদ্ধধনের রাজপ্রাসাদ আছে। ভেঙেচুরে একাকার প্রাসাদটি। মাটির উপরে ইটের দেয়াল কয়েক ফুট উঁচু হয়ে আছে, ছাদ নেই। এই দেয়ালগুলোর ভেতরে ঘুরতে ঘুরতে বুনু আর নানা সেই সময়কার গল্পগুলো নিজেদের ভেতর বলাবলি করছিল। আম্মু ক্যামেরায় ছবি তুলতে ব্যস্ত। আমার না তখন কিছুই ভাল লাগছিল না। একে তো গরম, একদম বাংলাদেশের মত ভ্যাপসা গরম, তার ভেতরে মশা কামড়াচ্ছিল খুব। এর ভেতরে আমার না খুব আব্বুর কথা মনে হচ্ছিল। আব্বু যদি থাকতেন আমাদের সাথে, আমি আব্বুর কোলে চড়তে পারতাম, গল্প করতে পারতাম। আব্বুর কথা মনে করেই আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল। আমি মশার কামড়ের জায়গা চুলকাই আর খুনখুন করে কাঁদি। কেঁদে কেঁদে বলছিলাম, আব্বুর কাছে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। আব্বুর কাছে যেতে ইচ্ছা হয়!

আব্বু এই গল্পটা শুনেই মুখটা অন্ধকার করে ফেলেন। আব্বুকে ছাড়া আমার খুব একা একা লাগত। আমাকে ছাড়া আব্বুরও যে খুব একা লাগত, এটা আমি বুঝি।

ইয়েতিটাও খুব একা।

আমার মাঝে মাঝে কষ্ট হয় বেচারাটার জন্য। ও একা, মানুষ একটু কষ্ট করে ওকে খুঁজে দেখবে, ওর বন্ধু হবে, তা না! ইয়েতি নেই নেই বলতে খুব আনন্দ আলসে মানুষের। অথচ এই মানুষরা মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। এই পৃথিবীর পুরোটা জানা হয়নি, সব প্রাণীদের চেনা হয়নি, মানুষ আছে অন্য পৃথিবীর খোঁজে, সারাক্ষণ ভাবছে ভিনগ্রহবাসী এলিয়েনদের কথা। মানুষ কেন এত বোকা? আমার খুব রাগ হয় এসব ভাবলে।

শ্রীমঙ্গলের লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ফরেস্ট অফিসার শ্যামল মামা, এ কথা শুনেই আম্মু বলে ফেললেন, এবার আর কোন বাহানা শুনব না। এই ছুটিতেই লাওয়াছড়া যাব আমি। তোমরা কি যাবে আমার সাথে?

আমি আর বুনু তো সঙ্গে সঙ্গে হাত উঠাই। আব্বু মুচকি হাসছিলেন। আম্মু খোঁচা মেরে বললেন, কেউ যদি ছুটি না পায়, আমাদের সঙ্গে যেতে না পারে, তাহলে আমার কি কিছু করার আছে?

সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত নেমে গেল। মুখের হাসিও কে যেন শুকিয়ে ফেলল এক নিমিষে। আব্বু ছুটি না পান, আব্বু যদি যেতে না পারেন, তাহলে? লাওয়াছড়ার জঙ্গল যত সুন্দরই হোক, আমার তো ভাল লাগবে না। আমি তো আবারো কেঁদে কেঁদে বলব, আব্বুর কাছে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আব্বু আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, তুমি তো এখন বড় হয়েছ মা। আট বছর বয়স হয়েছে, এখন তো আম্মু আর বোনকে নিয়ে তুমি দিব্যি ঘুরে বেড়াতে পারবে।

আমি কেঁদে ফেলি। আব্বু বললেন, লাওয়াছড়া খুব সুন্দর জায়গা। অনেক পশু-পাখি আছে। শুনেছি, ওখানকার মাটিতে মাঝে মাঝে বিগফুটের পায়ের ছাপ পাওয়া যায়।

বিগফুট!

লাওয়াছড়ার কাছেই তো হিমালয়। বোধহয় ওখান থেকে নেমে আসে মাঝে মাঝে।

বিগফুট ইয়েতি নয় তো? আমাকে অবাক করে দিয়ে আব্বু জানালেন, ইয়েতিও এক ধরনের বিগফুট।

আমি জানলাম, বিগফুট বলতে দৈত্য আকৃতির মানুষের মত এক ধরনের প্রাণীকে বোঝায়, যারা লুকিয়ে থাকে। সত্যি বলতে কি, এরা আছে কি নেই, তা নিয়ে দারুন রহস্য তৈরি হয়েছে মানুষের মনে। সারা পৃথিবীতেই এরকম বিগফুট আছে বলে সন্দেহ করা হয়, মাঝে মাঝে বিশাল বিশাল পায়ের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়।

আমি খুব ঝামেলায় পড়ে গেলাম। ইয়েতিকে খুঁজতে যাব বলে বড় হয়ে হিমালয়ের পাহাড়ে যাব বলে ঠিক করেছিলাম। এখন তো মনে হচ্ছে, কেবল ইয়েতি নয়, বিগফুটদের সব ক'টা প্রকারকে খুঁজে বের করা উচিত।

বুনুর সঙ্গে আলাপ করলাম বিষয়টি নিয়ে। ও খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনল সব। তারপর ও যা বলল, তাতে বুঝলাম তাই সারা পৃথিবী চষে বেড়াতে হবে আমাকে। কী আর করা! করতে যখন হবেই, তখন তো করতেই হবে। আমাকে বিশ্বপরিভ্রমণে বেরুতে হবে।

বুনু আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আমার বুনুটা পরিব্রাজক হবে! ইবনে বতুতার মত।

পরিব্রাজক শব্দটা এই প্রথম শুনলাম। যে নানা দেশ ঘুরে বেড়ায়, পর্যটক আর কি।

ইবনে বতুতার কথাও এই প্রথম জানলাম। মরক্কোতে জন্ম নেওয়া বিশ্ববিখ্যাত এই পর্যটক পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছেন। একুশ বছর বয়স থেকে শুরু করেছিলেন ঘোরাঘুরি। এর পরের ত্রিশ বছর যতটা ঘুরেছিলেন, তা যোগ দিলে নাকি প্রায় পঁচাত্তর হাজার মাইল হয়! শুনে খুব ভাল লাগল, আমাদের দেশেও তিনি এসেছিলেন।

বিগফুট নামটা কেমন বলতো? বিগফুট! বিগফুট!! এই ইংরেজি শব্দটার অর্থ তো বড় পা।

বুনু বলল, বিগফুটদের পা বড় বলে এই নাম হয়নি। পায়ের পাতাটা ইয়া বড়।

হয়। হয়। বুনু বলে, বিগফুটের পায়ের পাতা ওরকম বড়ই হয়।

বিগফুট আমার মাথার ভেতর ঢুকে গেল। এমন কিছু প্রাণী ও গাছ নাকি আছে, যাদের কথা আমরা কেবল শুনেছি, কখনো দেখিনি। সত্যি নাকি এসব? কখনো দেখা না পেলে তার কথা জানে কী করে মানুষ? রূপকথা নাকি এসব? না, না। পুরোপুরি রূপকথা মনে হচ্ছে না। কেননা, পৃথিবীতে বহু লোক এদের দেখেছে বলে দাবি করেছে। পৃথিবীর বহু জাতির মানুষ নিজেদের ভাষায় এর নাম দিয়েছে। নিজেদের ভাষায় এর চেহারার বর্ণনা দিয়েছে। আগেকার দিনে তো এক জাতির মানুষের কথা আরেক জাতির মানুষের জানতে পারাটা সহজ ছিল না। তাহলে সবাই মিলে কিভাবে টের পেল, এরকম কিছু বা কেউ আছে?

হাশেম আংকেলও বলেছিলেন, সবাই কিন্তু এক হয়ে বলছেন না, ইয়েতি নেই। কোন কোন গবেষক-বিজ্ঞানী ইয়েতি থাকতে পারে বলে মত দিয়েছেন। কেউ কেউ নিজের চোখে ইয়েতিকে দেখেছেন বলেও বলেছেন।

শ্যামল মামাও লাওয়াছড়ার জঙ্গলের মাটিতে দেবে যাওয়া পায়ের ছাপ দেখেছেন। ওটা নাকি অনেক বড়। কত বড়? আমি শুনে তো খুবই অবাক হলাম, মামা গজ-ফিতা দিয়ে মেপে দেখেছেন, ওটা সতের ইঞ্চি লম্বা।

শেষমেষ আব্বু ছুটি পেলেন বলে আমরা চারজনই এসেছিলাম লাওয়াছড়া। ট্রেনে চেপে ঢাকা থেকে শ্রীমঙ্গল। শ্যামল মামার জিপ ছিল ওখানে, আমাদের নিয়ে সোজা লাওয়াছড়ায় চলে এল। এমনিতে কিন্তু বাসে করে আসা যায়।

লাওয়াছড়া বাংলাদেশের একমাত্র রেইন ফরেস্ট। পশুপাখিদের অভয়ারণ্য। ৪০৭ প্রজাতির জীব-বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া গেছে এখানে। খামোখা তো আর একে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি।

খুব নিরিবিলি চারদিক। খাসিয়া, টিপরা, ত্রিপুরি আর মণিপুরি নামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস এখানে। এ ছাড়া কেবল পশুপাখি আর ঘন গাছপালা। আম্মু আমাদের চোখে চোখে রাখছিলেন– যদি হারিয়ে যাই!

আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে মাটিতে বিশাল পায়ের ছাপ খুঁজছিলাম। ঠিকমত খাওয়া দাওয়া হচ্ছিল না। রাগ করে আম্মু বলেছিলেন, ইয়েতি-বিগফুট এসবের মীমাংসা হলে বেঁচে যেতাম আমরা সবাই। আছে কি নেই, তা নিয়ে ধাঁধা আর ভাল লাগে না।

নেই।

লাওয়াছড়ার জঙ্গলে আমাদের চোখে কোন পায়ের ছাপ চোখে পড়ল না।

শ্যামলমামা মজা করে বললেন, এ জঙ্গলে সামান্য কয়েকটা পশ্চিমি হুলক উল্লুক আছে। ওদেরকেই বিগফুট বলে চালিয়ে দিতে হবে। যদি আর কাউকে না পাই, শিন্নু সোনার মন ভাল করে দেওয়ার জন্য ওদেরকেই ডেকে আনব।

আমি সেটা মোটেও চাই না। সত্যিকারের বিগফুটের খোঁজ চাই আমি।

● পরবর্তী সংখ্যায়

নাসরীন মুস্তাফা কথাসাহিত্যিক ও বিজ্ঞান লেখক

Coca-Cola

খোলো খুশির জোয়ার!

সৌহার্দ

ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ভারত সরকার প্রত্যেক বছরে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন-আইটিইসি) কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রস্তাব দিচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৫০টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এসব স্বল্পমেয়াদী কোর্সের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় যেমন– একাউন্টিং, টেলিযোগাযোগ, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য বিশেষায়িত কারিগরি কোর্স। ভারত সরকার ৩-৬ মাসের সংক্ষিপ্ত ও মাঝারি মেয়াদি এসব কোর্সের ব্যয়ভার বহন করে।

যোগ্যতা

আবেদনকারীর বয়স ২৫-৪৫ বছরের মধ্যে হবে এবং সরকারি-বেসরকারি বিশেষায়িত কোর্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউস বা বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এ কোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ইংরেজির ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

কিভাবে আবেদন করবেন

আইটিইসি-র যে-কোন কোর্সে আবেদন করতে হলে আবেদনকারীকে আইটিইসি-র https://itecgoi.in পোর্টালে গিয়ে নিজস্ব লগইন ও পাসওয়ার্ড তৈরি করে নিজেদের নাম রেজিস্টার করতে হবে। তারপর অনলাইনে মনোনীত কোর্সে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর আবেদনকারী ফরম ডাউনলোড করে আবেদনপত্রটি হাইকমিশন অফ ইন্ডিয়া, ঢাকা-য় ফরওয়ার্ড করবেন।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। কোর্সের বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে:- http://itec.mea.gov.in লিঙ্কগুলো ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট www.hcidhaka.gov.in-এর Education & Training সেকশনেও পাওয়া যাচ্ছে। যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন: fshoc@hcidhaka.gov.in এবং commerce@hcidhaka.gov.in

Training Programme in India

The Government of India offers the training courses under the India Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme every year. The courses include diverse subjects such as Accounting, Telecommunication, English, Management, Rural Development and other specialized technical courses in over 50 reputed Institutions across India. These are short and medium term courses of between 3-6 months duration and are completely sponsored by the Government of India.

Eligibility

The applicants must be between 25-45 years of age and should have 5 yearsÕ relevant work experience in the area of specialized course in either Government or in a private organisation. They may belong to Government, Universities, reputed corporate houses or trade bodies. Working knowledge of English is essential.

How to apply

To apply for any ITEC course, the applicant must visit ITEC portal at https://itecgoi.in and register himself/herself by creating their own login and password. Thereafter, apply for the selected course online. After submitting the application form, the selected course online. After submitting the application form, the applicant should download the form and forward the application to the High Commission of India, Dhaka along with a letter of recommendation from the parent organisation of the applicant. Applicants working in the Government must approach the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance or the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Bangladesh for recommending the applications. The details of courses on offer for the year and application forms can be downloaded at the following links :-
http://itec.mea.gov.in
The links are also available at the website of the High Commission of India at www.hcidhaka.gov.in under the Education & Training section.
Any queries may be addressed to fshoc@hcidhaka.gov.in & commerce@hcidhaka.gov.in

প্রবন্ধ

জরাসন্ধের গল্পের বর্ণময় ভুবন

জ্যোতির্ময় দাশ

বাংলা সাহিত্যে জরাসন্ধকে শরৎচন্দ্রের উত্তরসাধক বলে ধরা হয়। জরাসন্ধ নিজেও বার বার শরৎচন্দ্রকে তাঁর সাহিত্য-জীবনের গুরু বলে স্বীকার করেছেন। আর এজন্যে তিনি বিন্দুমাত্র লজ্জিত নন। শরৎসাহিত্য তাঁর প্রেরণার উৎস ছিল। অবহেলিত মানবতার প্রতি শরৎচন্দ্রের দরদ ও বিচিত্র মানবজীবনের অভিজ্ঞতা জরাসন্ধকে সাহিত্যরচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। 'আমার সাহিত্যকর্মের পূর্বাভাষ' নামে এক নিবন্ধে জরাসন্ধ লিখেছেন:

যখন প্রেসিডেন্সিতে পড়ি– ১৯২৩ সালের কথা– আমাকে একাধিকবার যেতে হয়েছিল তাঁর (শরৎচন্দ্রের) বাজে শিবপুরের বাড়িতে। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। নানা কথাবার্তার মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ মুহূর্তে কাঁচা রয়সের কৌতূহলভরেই বোধহয় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর উপন্যাসগুলিতে এত পতিতা চরিত্র কেন?

... ধীরে ধীরে বললেন, 'বিশেষ কারণ আর কী? তবে এটুকু বলতে পারি, তোমরা যাকে পতিতা বল সেইরকম কয়েকজন হতভাগিনীকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। যা পেয়েছি– থাক্, তুমি ছেলেমানুষ, সে-সব তোমাকে বোঝানো যাবে না।'

... কিছুক্ষণ বিরতির পর আশ্চর্য করুণ কণ্ঠে বললেন, যেন নিজেকেই শোনাচ্ছেন কথাগুলো– 'সে সব কিছু নয়। কোনো মানুষ নিছক কালো, তার মধ্যে কোনো রিডিমিং ফিচার নেই একথা ভাবতে আমার কষ্ট হয়। ও আমি পারি না।'

... সেদিন যা শুনেছিলুম তারই একটা রেশ হয়তো থেকে গিয়েছিল আমার অন্তরের কোনো গভীর কোণে। আমি জানতে পারিনি। দীর্ঘকাল পরে ঘটনাচক্রে যখন এমন একটা রাজ্য এসে পড়লাম যার মধ্যে শুধু 'কালো' মানুষের ভিড়, তখন বোধহয় বাজে শিবপুরের সেই ছোট একতলা বাড়ির বারান্দায় মৃদু কোমলকণ্ঠে থেমে থেমে বলা ক'টি কথা আমার অবচেতন মনের অন্তরাল থেকে নিঃশব্দে মাথা তুলে উঠেছিল। আর এই চোখদুটোও চারদিকে চেয়ে খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিল কোথায় আছে সেই রিডিমিং ফিচার নামক দুর্লভ বস্তুটি।

শরৎচন্দ্র পদস্খলিতা রমণীর মধ্যে সাধ্বী প্রণয়িনী, চরিত্রহীনের মধ্যে চরিত্রবানকে আবিষ্কার করেছেন। জরাসন্ধ আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন। তিনি কেবল নিপীড়িত লাঞ্ছিত নরনারীর কথাই বলেননি, দণ্ডিত অপরাধীর হৃদয়ের ফল্গুধারাও উদ্ঘাটন করেছেন।

> এই যে তোমাকে বললাম, একশ বছর বেঁচে থাকো; তুমি ভাবছ ওটা একটা কথার কথা; অনেকেই বলে থাকে। আসলে কিন্তু তা নয়। একশ বছর বেঁচে থাকা এমন কিছু কঠিন নয়, ইফ্ ইউ অনলি নো দি আর্ট ওব্ লিভিং। মুখে যে যাই বলুক দীর্ঘজীবন পেতে চায় সকলেই; কিন্তু কী করে পেতে হয় সে রাস্তাটা খুব কম লোকের জানা আছে।

এ হল একটা দিক। কিন্তু জরাসন্ধ এত নিবিড়ভাবে শরৎ-অনুসারী যে তাঁর সাহিত্যচেতনার বিশ্লেষণ করতে বসলে আমাদের আবার অন্য একটি শরৎ-প্রসঙ্গের দ্বারস্থ হতে হয়। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র একবার বলেছিলেন যে, খুনের অপরাধে জজসাহেব যখন হতভাগ্যের প্রাণদণ্ড দান করেন তখন তিনি বিচারক, কিন্তু অপরাধীর অন্তরের দুর্বলতা অনুভব করে যখন তিনি দণ্ড লঘু করেন, তখন তিনি কবি। আর সেই কবির কাজ যে শুধু সৃষ্টি করাই তা নয়, সেই সৃষ্টিকে রক্ষা করাও তাঁর কাজ। যা স্বভাবত সুন্দর তাকে যেমন আরও সুন্দর করে প্রকাশ করা তাঁর একটা কাজ, যা সুন্দর নয়, তাকেও অসুন্দররের হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলা তাঁরই আর একটা কাজ।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের এই চমৎকার উপলব্ধির মধ্যেই রয়েছে জরাসন্ধের সাহিত্যকৃতির সার্থকতা। লৌহকপাটের অন্তরালে অবস্থান করে মানুষের অন্তর্লোককে অত্যন্ত নিখুঁত করে দেখা ও সেগুলিকে নিপুণ চিত্রশিল্পীর মত নানাবর্ণে, বিচিত্ররূপে সুসজ্জিত করে তোলাই ছিল জরাসন্ধের জীবনের ব্রত। এখানেই তিনি একান্তভাবে শরৎ-অনুসারী।

এই সূচনাটুকু করার পর জরাসন্ধের সাহিত্যকৃতির সূচনার প্রসঙ্গটি প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়ে। 'জরাসন্ধ' ছদ্মনামের আড়ালে প্রকৃত মানুষটির নাম চারুচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০২-'৮১)। স্কুল জীবনে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯২০ সালে হেয়ার স্কুল থেকে সপ্তম স্থান অধিকার করে ম্যাট্রিক এবং ১৯২৬-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে এম এ পাশ করেন বিশেষ সম্মানের সঙ্গে। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে *লৌহকপাট* উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে *দেশ* সাপ্তাহিকে প্রকাশের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জরাসন্ধ প্রায় রাতারাতি 'লেখক' হয়ে ওঠেন। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েছে। অনেকেই তাঁকে রাজশেখর বসুর মত প্রৌঢ় বয়সে সাহিত্যজীবনে প্রবেশের দোসর মনে করেন। কিন্তু জরাসন্ধের ক্ষেত্রে কথাটা সঠিক নয়। তাঁর একটা প্রাক্‌প্রস্তুতিপর্ব ছিল। গাছ যেমন আপনা থেকে অর্থাৎ 'আউট অফ নাথিং' হঠাৎ গজিয়ে ওঠে না, তার নীচে বীজ থাকে, মাটিকেও উপযুক্তভাবে তৈরি হতে হয়, সাহিত্যের বেলাতেও তাই।

জরাসন্ধ স্কুলজীবনে বারো বছর বয়সে পাঠ্য বইয়ে রবীন্দ্রনাথের 'শরৎ' নামে একটি কবিতা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে 'বাগ্‌দেবী-বন্দনা' নামে একটি কবিতা লেখেন এবং সেটি পাবনার *সুরাজ* সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়। পরে কলকাতার হেয়ার স্কুলের ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু অভিভাবক দাদার শাসনে শিক্ষাজীবনে কৃতী হবার আদেশে আভিমানভরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছ'সাত বছর সাহিত্যকে আর কাছে ঘেঁষতে দেননি। এম এ পাশ করার পর আবার গল্প লিখতে থাকেন এবং বেশ কিছু গল্প *বিচিত্রায়* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় চিঠি লিখে নবীন লেখককে উৎসাহিত করেন। সে সময়ে *রামধনু*, *শিশুসাথী* ও অন্য কয়েকটি কিশোর পত্রিকাতেও গল্প লিখতে থাকেন এবং *রংচং*, *রবিবার*, *গল্প লেখা হল না* নামে শিশুসাহিত্যের ৩/৪টি গল্পগ্রন্থও প্রকাশিত হয়। এই সময় সরকারি কারা বিভাগে চাকরি পেয়ে ডেপুটি জেলার হিসেবে (১৯২৬)-এ দার্জিলিংয়ে কর্মজীবন শুরু করেন এবং সাময়িকভাবে সাহিত্যচর্চায় ইতি ঘটে।

তারপর দীর্ঘ পঁচিশবছর তিনি লেখালিখির মধ্যে ছিলেন না। সেই সময়ের কথা এবং আবার সাহিত্যসাধনা কীভাবে শুরু হল সেটা তার নিজের লেখা থেকেই উদ্ধৃত করা যাক:

> ... চাকরি নামক সিন্ধবাদ আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সারা বাংলার এক জেল থেকে আর এক জেলে। কোথাও ছ'মাস কোথাও এক, দুই, তিন বছর। মাঝে মাঝে মাথা তুলে লক্ষ্য করেছি বিরাট লৌহতোরণের ভিতর দিয়ে যারা আসে যায়। জানবার চেষ্টা করেছি কারা তারা, কেন এল, কেমন করে এল।... জীবনের একটা দিক গাঢ় পরদায় ঢাকা। তবু তারই ফাঁকে কখনো কোনো সূত্রে পেয়ে গেছি কারো গহন মনের নিগূঢ় ইতিহাস– সুখে সমুজ্জ্বল, দুঃখে পরিম্লান, হিংসায় ভয়ংকর, প্রেমে জ্যোতির্ময়। সভ্য সমাজের কাছে এরা সবাই 'অমানুষ' বলে চিহ্নিত।... তবু কারো কারো বেলায় মনে হয়েছে ঐ শব্দটার মধ্যেই তাদের সব পরিচয় নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তার বাইরেও কিছু আছে।
>
> একদিন নয়, দুদিন নয়, দীর্ঘ পঁচিশ বছর এদের নিয়ে আমি একটানা ঘর করে গেছি। যা দেখেছি, শুনেছি, অনুভব করেছি মনের মধ্যেই ছিল। তারপর হঠাৎ কেমন করে তারা একদিন একটা মলাটছেঁড়া পুরোনো খাতায় গিয়ে জড়ো হল সে রহস্য আজও ভেদ করতে পারিনি। একটা কারণ হতে পারে। আমার বয়স তখন আটচল্লিশ পেরিয়ে গেছে। ঊনপঞ্চাশ-পবন শুনেছি অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। এটা হয়ত তারই কারসাজি।
>
> পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে চারুচন্দ্র তখন কৃষ্ণনগর ডিস্ট্রিক্ট জেলের কর্ণধার। তাঁরই এক অধস্তন সহকর্মী হরিপদ রায় সেই 'ছেঁড়ামলাটে'র খাতাটির সন্ধান পেয়ে প্রথমে নিজে পড়ে এতটাই বিস্মিত হন যে সরাসরি *দেশ* পত্রিকার দপ্তরে এসে খাতাটি সহকারী সম্পাদক সাগরময় ঘোষের হাতে তুলে দিয়ে একটিমাত্র বাক্যে প্রার্থনা করেছিলেন, 'লেখাটা একবার পড়ে দেখুন সাগরদা।'

ব্যাপারটা খুব সহজ বা সামান্য ছিল না। কোন এক নামগোত্রহীন অপরিচিত 'লেখকের' মোটা খাতা পড়বার মত অবসর অতবড় নামী পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে নিতান্তই দুর্লভ। কিন্তু হরিপদ নাছোড়বান্দা। তাঁর কেবল একটাই দাবি, পাণ্ডুলিপিটি একবার যেন পড়ে দেখা হয়। সাগরময় ঘোষ পড়লেন, মুগ্ধ হলেন এবং নামকরণ করলেন *লৌহকপাট*। *দেশ* পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক-প্রকাশক মহলে সাড়া পড়ে গেল– 'কে এই জরাসন্ধ'! 'আশ্চর্য'! 'এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে'! 'কোথায় লুকিয়ে ছিলেন এতদিন'?

লৌহকপাট প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন:

> *লৌহকপাট* ঠিক উপন্যাস নহে, অনেকগুলি উপন্যাসধর্মী খণ্ড ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনীর সমষ্টি।... *লৌহকপাট* গ্রন্থে জরাসন্ধের কৃতিত্ব হইতেছে যে, মনের যেটুকু খেলা লেখকের ক্ষুদ্র পশ্চাৎপটে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মানবিকতা ও শিল্পায়নের কোনো খুঁত নাই, তাহার সবটুকু রসনির্যাস লেখকের লেখনীমুখে উঠিয়া আসিয়াছে। প্রকাশভঙ্গীর চারুতা, মন্তব্য ও জীবন-সমালোচনার করুণ,

সমবেদনা-স্নিগ্ধ যাথার্থ্যই জেলের ক্ষুদ্র পরিসরে লেখককে মানবমনের দরদী পাঠক ও ভাবশিল্পীরূপে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।... নদীমাতৃক অশ্রুপ্লাবিত বাংলা দেশের অন্তঃকরণ ভেদ করিয়া যে ক্ষুদ্র ঝরণা উত্তপ্ত বালির ভিতর দিয়া শীর্ণধারায় প্রবাহিত হইতেছে, সাহিত্য-কমণ্ডলুতে তাহার কিছুটা 'জরাসন্ধ' ধরিয়া রাখিয়াছেন। ইহার আস্বাদ জীবনপিয়াসী পাঠককে চিরদিনই মুগ্ধ করিবে।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড বলেছেন যে, আমরা যাকে অ্যাবনরমাল সাইকোলজি বা মনোবিকৃতি বলি, তা সুস্থ স্বাভাবিক মানসিকতার থেকে খুব বেশি পৃথক নয়। জরাসন্ধ নিপুণ মনোবিদের মতই লৌহকারার অন্তরালে খুনী ডাকাত ও অন্যান্য বিচিত্র ধরনের অপরাধীর মনোবিশ্লেষণ করে তাদের চরিত্রের আলো-আঁধারির বিভিন্ন দিককে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে সহানুভূতি, সমবেদনা ও ভালবাসার মানসিকতায় প্রকাশ করেছেন– যাকে বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে একটি ব্যতিক্রমী অধ্যায় বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

দুই.

জরাসন্ধের গল্প আলোচনার শুরুতে *লৌহকপাট* নিয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা করা হল তা এই কারণে প্রাসঙ্গিক যে জরাসন্ধের সাহিত্য-জীবনের অভ্যুত্থান, নাম-যশ সবই *লৌহকপাট*কেন্দ্রিক। যেমন যাযাবর-এর *দৃষ্টিপাত*! তাছাড়া *লৌহকপাট*ভিত্তিক আলোচনা থেকে আমরা গল্পলেখক জরাসন্ধের সাহিত্যসৃজনের মানসভূমির সন্ধানটিও সম্যকভাবে পেয়ে যাই যেটা তাঁর গল্পের জগতকেও অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছে। *লৌহকপাট*-এর ব্যাপক প্রভাবের কারণে জরাসন্ধের রচনাকে অধ্যাপক-সমালোচক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'কারা সাহিত্য' আখ্যায় কিছুটা একপেশে বা একঘরে করে দিয়েছেন। কিন্তু কারাগার থেকে সকলেই যেমন একদিন মুক্তিলাভ করে, তেমনি জরাসন্ধ তার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও বিচরণ করেছেন।

জরাসন্ধের *গল্প সমগ্র*তে আমরা একশো গল্প নথিভুক্ত হবার সন্ধান পাই। তারমধ্যে কারাগারের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা গল্পের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। সেই সঙ্গে কারাগারের বাইরের মানুষকে নিয়ে লেখার পরিমাণও পর্যাপ্ত। এবং সেখানে বিষয়বৈচিত্র্যেরও বিবিধ রত্ন ছড়িয়ে রয়েছে। আসলে পাঠক হিসেবে আমাদের একটি বড় দোষ হল, খুব সহজেই আমরা কবি-সাহিত্যিকদের একটা মার্কা দিয়ে চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত। নজরুলকে আমরা বলি বিদ্রোহী কবি, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে বলি দুঃখবাদী কবি, মোহিতলাল মজুমদার আমাদের কাছে দেহবাদী কবি বা জীবনানন্দ দাশ নির্জনতার কবি। এই একই মানসিকতায় *লৌহকপাটে*র জন্য জরাসন্ধকে আমরা কারা সাহিত্যের লেখক তকমায় ভূষিত করেছি। এখানে আমাদের একটা কথা অন্তত ভাবা উচিত, কোন একটি অভিনব বিষয় নিয়ে কিছু লিখলেই তা সাহিত্য হয়ে ওঠে না, লেখকের বিশেষ সৃজনক্ষমতাতেই রচনা সাহিত্য হয়ে ওঠে। তাই কারা সাহিত্য যদি সাহিত্য হয়ে উঠতে পেরে থাকে তবে তা রচনার গুণেই সাহিত্য হয়েছে তার বিষয়ের গুণে নয়।

জরাসন্ধের নির্বাচিত *গল্পশতক* (*গল্প সমগ্র*-র একশোটি গল্পের বাইরেও তাঁর আরও কিছু গল্প আছে বলেই আমরা বিশ্বাস করি) থেকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা ও আঙ্গিকের কয়েকটি গল্প বিশ্লেষণ করে আমরা জরাসন্ধের রচনাবৈচিত্র্যের কথা পাঠকের সামনে তুলে ধরব।

শুরু করা যাক কারাগারের বাইরের একটা গল্প দিয়ে। কৌতুক গল্পেও যে জরাসন্ধ যথেষ্ট সাবলীল তার প্রমাণ পাওয়া যায় *গুরুদেব* গল্পটি থেকে। সুবীর ঘোষ বর্মায় নৌবিভাগে বড় চাকরি করতেন। অবসরের পর রাজনৈতিক ডামাডোলে ভারতে চলে আসেন। পৈত্রিক বাড়ি টালিগঞ্জের চারপাশে পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল শরণার্থীদের ভিড়ের হাত থেকে বাঁচতে খোলামেলা দক্ষিণেশ্বরের উপকণ্ঠে একটা বাগানবাড়ি কিনে ফেলেন। পুরনো ধরনের জমিদার বাড়ি। আগের মালিকের সময়ে বৈঠকখানার হলঘর, সিঁড়ির ল্যান্ডিং সর্বত্র বড় বড় ছবি ছিল। তার প্রমাণ বিদ্যমান। সুবীর ঘোষ নিজেও ছবি ভালবাসেন। তিনি বাড়িটিকে মনের মত ছবি দিয়ে সাজিয়ে তুলতে লাগলেন। তিনি পোর্ট্রেট্ বা নরনারীর ছবির থেকে নিসর্গের ছবি, যাকে সাধারণ ভাষায় ল্যান্ডস্কেপ বলে, সেই প্রকৃতির ছবির পূজারি। আধুনিক বা মডার্ন আর্টকে ঠিক মেনে নিতে পারেন না। জরাসন্ধ নায়কের জবানিতে আধুনিক চিত্রকলার প্রতি বেশ একটু তির্যক সমালোচনা করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে চিত্রশিল্পের নন্দনতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ছুঁয়ে গেছেন। সেটি এই ধরনের:

আধুনিক আর্ট বলতে যা বোঝায়, তার উপরে সুবীর ঘোষের আস্থা নেই। প্রকৃতি যাকে যে-রূপ দিয়েছেন, সেই রূপেই তাকে দেখতে চান। কোন রকম বিকৃতি তার পছন্দ নয়। পরিবর্তন যদি করতেই হয় তার একমাত্র মাপকাঠি হবে সৌন্দর্যবৃদ্ধি– সেটা দেখতে আরও সুন্দর হল কিনা। মানুষ আঁকতে গিয়ে তার মুখটাকে টেনে ঘোড়ার মত লম্বা করা, নাকটাকে চেপে বসিয়ে দেওয়া, হাত-পাগুলোকে কাঠির মত করে দেখানো– এসব বিকার তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না।... বন্ধু বোঝাতে চেয়েছেন, ওটা বিকার নয়, ওর মধ্যেই তো সৃষ্টির ইঙ্গিত। শিল্পী ফটোগ্রাফার নন, তিনি স্রষ্টা। চিত্র আর আলোকচিত্র এক জিনিস নয়।

মিস্টার ঘোষ বলেছেন, ও-সব আমি বুঝি না। ছবির ব্যাপারে একমাত্র বিচারক আমার চোখ, আমার মন। ঐ চারহাত লম্বা ঠ্যাং-ওয়ালা মানুষটাকে আমি মানুষ বলে মেনে নিতে পারলাম না। ও আমার চোখে অসুন্দর, বিকৃত। ব্যস; এর বেশী আমার আর কিছু দেখবার নেই।

সুবীর ঘোষ সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের এক প্রশস্ত দেওয়ালে তাঁর সবথেকে প্রিয় একটি ল্যান্ডস্কেপ ছবি পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিয়ে একবছর ধরে মনের মত করে আঁকালেন। দামি ফ্রেমে বাঁধানোও হল। বিশাল ছবি– দেওয়ালে টাঙানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ও লোকবলের আয়োজনও করা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ কাকার অসুস্থতার খবরে কানপুরে যেতে হল। ফিরলেন দিন সাতেক বাদে। ফেরার সময় সারা পথ ছবির কথাই ভেবেছেন। প্যাকিং খোলা অবস্থায় চাকরেরা ঠিকমত সেটাকে রেখেছে কিনা, অসাবধান চাকরেরা ঘর ধোয়া-পোঁছা করতে গিয়ে ধুলো কাদা লাগিয়েছে কিনা, তা নিয়ে উদ্বেগ ছিল খুবই। বাড়ি ফিরেই তিনি ছবির খোঁজে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই ল্যান্ডিংয়ের স্থানটি– যে প্রিয় স্থানটিতে তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছবিটি থাকবে। জায়গাটা আর একবার ভাল করে দেখার জন্য আলোর সুইচে হাত দিলেন। কী দেখলেন?

হঠাৎ জ্বলে-ওঠা পাঁচশো পাওয়ারের তীব্র আলোয় ঘোষসাহেব প্রথমটা কিছু ঠাওর করতে পারলেন না। পরক্ষণেই তাঁর গলার ভিতর থেকে কেমন একটা আঁৎকে ওঠার অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এল।

সামানে কয়েক গজমাত্র দূরে তাঁর সযত্ন-রক্ষিত ফাঁকটুকু জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা সোনালি ফ্রেমে বাঁধা এক বিশালাকায় তৈলচিত্র পূর্ণাঙ্গ মানুষ। একটুকরো কৌপীন ছাড়া দেহের কোথাও কোন বস্ত্র নেই। এক মাথা জট পাকানো চুল, এক মুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি, এক বুক ঘন লোম। কোটরে ঢোকানো চোখ দুটোয় কেমন একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক। কণ্ঠার হাড় দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। শুকনো শিরাবহুল হাত-পা। তার উপরে একটা কালো, কুঁচকে যাওয়া খরখরে চামড়ার আবরণ।

শুধু কুশ্রী বললে কিছুই বলা হল না। ঘোষসাহেবের মনে হল, মানুষের যে সহজ সৌন্দর্যবোধ, ঐ ছবি এবং তার শিল্পী তাকে যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছে।

অমলা (স্ত্রী) দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে গাঢ়স্বরে বললেন, আমার গুরুদেব। ঘোষসাহেব এদিক ওদিকে চেয়ে বোধহয় বসে পড়বার মত কোন একটা আশ্রয় খুঁজছিলেন। স্ত্রী বলেন, কী হল? কি খুঁজছ?

ঘোষসাহেব জবাব দিলেন না। দেবার চেষ্টা হয়তো করেছিলেন, কণ্ঠে স্বর ফোটেনি।

গল্পটি এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু জরাসন্ধ কৌতুকের ভিয়েনে পাঠকের ভোজনের বিস্তৃত আয়োজন করেছেন। রাশভারি স্ত্রীর কাছে ঘোষসাহেব করুণ আবেদন করেছিলেন যে, ওই স্থানের জন্য অন্য ছবি আছে। স্ত্রী সেই ছবিকে নস্যাৎ করে দিলেন।

সেদিন রাতে বাড়িতে ছিঁচকে চোর ঢুকেছিল। মানসিক বেদনায় ঘোষসাহেব ঘুমোতে পারেননি। সামান্য শব্দেই তিনি চোরকে ধরে ফেললেন। চোর তখনও কিছুই নেয়নি, সবে ঢুকেছিল। হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে ঘোষসাহেব তার সঙ্গে চুক্তি করলেন মুক্তির শর্তের যে, অন্য একদিন (খুব তাড়াতাড়ি) এসে ওই গুরুদেবের ছবিটি চুরি করতে হবে–

তাহলে তাকে তিনি নগদ পুরস্কার দেবেন। তিনদিন পরে চোর এসে চুরি করল। স্ত্রী সকালে সেই চুরির খবরে একেবারে ভেঙে পড়লেন। কারণ তিনি তার একুশভরি সোনার গহনা ভেঙে উপরন্তু পাঁচশো টাকা মজুরি দিয়ে খাঁটি সোনার ফ্রেম দিয়ে গুরুদেবের ফটো বাঁধিয়েছিলেন! গল্পের শেষ অনুচ্ছেদ এই ধরনের:

ঘোষসাহেবের দৃষ্টি পড়ল দেওয়ালের গায়ে। বিশ্বস্ত চোর তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। তবে পুরোটা নয়। সাধু-সঙ্গে তার প্রয়োজন নেই বলেই তাঁকে ফেলে রেখে গেছে। কিন্তু তাঁর প্রতি কোন অসম্মান বা অবহেলা দেখায়নি।

ফ্রেমহীন কাচের অন্তরালে অক্ষতদেহে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছেন গুরুদেব। চোখের সেই প্রচ্ছন্ন কৌতুক অনেকটা যেন স্পষ্ট।

কৌতুক গল্পের ক্ষেত্রে যে তাঁর সহজাত ক্ষমতা ছিল সেটি অন্য এক হাসির গল্পে আরও বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হতে দেখি। *তিলোত্তমা* নামে সংকলনের প্রথম গল্পটি এই ধরনের। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যারিস্টারের ছেলে শীর্ষেন্দু ডাক্তারি পাশ করার পর বিলেতে স্পেশালাইজেশন করতে গেছে। ব্যারিস্টার তিনকড়ি লাহিড়ী শুধু নামেই বাঙালি, আচার-আচরণে পুরোদস্তুর সাহেব। ছেলে বাবার আদর্শে দেহে-মনে দুটি মানদণ্ডেই আরও উঁচুদরের সাহেব। বিলেতের বিশেষ ডিগ্রি অর্জন করে সে বিলেতেই থেকে চাকরি করতে শুরু করে, ফ্ল্যাটও কিনে স্থায়ী বসবাসের পরিকল্পনা করেছে। বাবা-মার তাতে আপত্তি নেই। তাঁরা জানালেন একবার দেশে এসে বিয়ে করে যায় যেন। তাঁদের অনুরোধে এবার দেশে আসছে সপ্তাদুয়েকের জন্য। বাবা-মার ইচ্ছে তার মধ্যেই ছেলের বিয়ে সেরে ফেলা। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে পাত্রী জোগাড় করতে দেশ উজাড় হয়ে গেল। রূপে-গুণে-চাকরিতে সেরা ছেলের পাত্রীর সন্ধান রীতিমত এক কঠিন সমস্যা। পাত্রীকে একেবারে তিলোত্তমা হওয়া দরকার। শেষপর্যন্ত তেমন পাত্রীও পাওয়া গেল। ঘর, বংশ, রূপ সবই পছন্দ হল। ছেলেপক্ষ থেকে পাকা কথাও দেওয়া হল। ভাবী বৈবাহিককে নিয়েই এয়ারপোর্টে ছেলেকে রিসিভ করতে গেলেন লাহিড়ীসাহেব। দূর থেকে ছেলেকে দেখে বৈবাহিকও মুগ্ধ হলেন, তাঁর রূপসী কন্যার উপযুক্ত পাত্রই বটে। তারপর?

'ভাবী বৈবাহিকের সঙ্গে ছেলের পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন লাহিড়ী, সেই মুহূর্তে শীর্ষেন্দু পিছন ফিরে একটি মেয়ের বাহু ধরে এনে দাঁড় করালো ওঁদের সামনে। ঘোর কালো রঙ, ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিকের প্রলেপ, মোটাসোটা, বেঁটে, চওড়া কপাল, সামনের দাঁত দুটো ভীষণ উঁচু। পরিচয় করিয়ে দিল– মিস্ নবুটু, মাই ফিয়াঁসি। আফ্রিকার মেয়ে। ওর বাবার লন্ডনে মস্ত বড় হোটেল আছে। ও সেসব দেখাশোনা করে। লন্ডন এয়ারপোর্টে আলাপ। প্লেনে সিট পড়েছিল পাশাপাশি। সেখানেই প্রোপোজ করলাম। সী হ্যাড এগ্রিড। ইন্ডিয়া দেখতে এসেছে। একসঙ্গেই ফিরবো।'

কৌতুকবোধের সুরটি জরাসন্ধের চরিত্রে তাঁর মানবতাবোধের মতই প্রচ্ছন্ন। কারাগারের পটভূমিকাতেও যে হাসির উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে তার চমৎকার আলেখ্য তিনি তুলে ধরেছেন নানান গল্পে। তেমনই একটি হাসির গল্পের নাম *কই মাছ*। কারাগারে বিভিন্ন ধরনের বন্দীরা আসে, তার মধ্যে চোর জোচ্চোর খুনি যেমন আছে তেমনি আছে রাজনৈতিক নেতা, যাদের জেল কোডে ডেটিনিউ বলা হয়। এই ডেটিনিউদের নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষের সকলেরই মাথাখারাপ হবার উপক্রম। কারণ তাদের সবসময়েই নতুন নতুন চাহিদা এবং সে চাহিদা তৎক্ষণাৎ না হলেও অচিরেই মেটাতে হবে। যেমন একদিন তাদের হঠাৎ করে কই মাছ খাবার শখ হল। দুশোজন ডেটিনিউয়ের জন্য দুটো করে এক মাপের চারশো কই মাছ জোগাড় করা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। এই নিয়ে যখন কারাগার তোলপাড় এবং একটা ছোটোখাটো আন্দোলনের পরিস্থিতি তখন বিষয়টা জেলার সাহেব অবধি পৌঁছল। তিনি মুশকিল আসানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। বললেন, কই মাছ পাওয়া যাবে– একেবারে ওজন মেপে এক সাইজের, তবে একটু সময় দিতে হবে জোগাড় করার জন্য। এবার জরাসন্ধের ভাষায় শোনা যাক:

'বেশ তো, কাল, না হয় পরশু, কিংবা তার পরের দিন দেবেন।'

'আজ্ঞে না, অতো শীগগির হবে না।'

'তাহলে কত সময় চান?'

'অন্তত এক বছর।'

'এক বছর। আপনি কি আমার সঙ্গে তামাশা করছেন?'

'কি যে বলেন। আপনার সঙ্গে তামাশা! Seriously বলছি। এক সাইজের চারশ কই মাছ বাজার ঢুঁড়েও মিলবে না, এটা common sense, কাজেই আপনার অর্ডার আমরা West Bengal Government-এর Fisharies Department-এ পাঠিয়ে দেবো। তারা পুকুরে ডিম ফেলবে। সে ডিম ফুটবে, বাচ্চা বেরোবে। সেগুলো বড়সড়ো অর্থাৎ খাবার মত হতে বছরখানেক তো লাগবেই। তবে সাইজের তফাৎ হবে না।'

গল্পের শেষ হচ্ছে পরের একটিমাত্র পঙ্‌ক্তিতে যে, 'একটু পরেই কইমাছের বদলে রুইমাছের অর্ডার এল ভুজঙ্গের দপ্তরে।'

জরাসন্ধ বিরচিত বিভিন্ন আঙ্গিকের গল্পের পরিচয় তুলে ধরার প্রয়োজনে এই ধরনের গল্পের আর কোনও দৃষ্টান্ত দেওয়া হল না, কিন্তু এই রীতির মজার গল্প, বিশেষ করে হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, নির্মল কৌতুক পরিবেশনের কাজে বাংলা সাহিত্যে জরাসন্ধের জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার। এবার একটু অন্য পটভূমির গল্পের খোঁজ করা যাক।

দীর্ঘ ৩৫ বছর কারাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে সেই জগৎ সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ঝুলি তাঁর প্রায় অফুরন্ত ছিল। *লৌহকপাট*-এর মত সরাসরি প্রত্যক্ষ চরিত্র ছাড়াও কারাগারের চারপাশে অনেক পরোক্ষ চরিত্রেরও আনাগোনা থাকে। কারাগারের সঙ্গে ফাঁসির একটি নিকট সম্পর্ক আছে, এবং ফাঁসি থাকে বলেই একটি ফাঁসুড়ে বা হ্যাংম্যানও থাকবে। জরাসন্ধের একটি অনন্যসাধারণ গল্প *হ্যাংম্যান* এবং এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মধু ডোমও একটি বিখ্যাত চরিত্রের দাবি জানাতে বা মর্যাদা পেতে পারে। কারাগারে এই হ্যাংম্যানের ভূমিকা কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ফাঁসি মানেই গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া নয়– ম্যানিলা দড়ির ফাঁস পরিয়ে 'নট'-টা ঠিক ঘাড়ের পেছনে সঠিক জায়গায় রাখতে পারলে তবেই ঝুলে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ের হাড় ভেঙে মৃত্যু হবে। তা না হলে কিন্তু কেলেঙ্কারির একশেষ। তবে সুদক্ষ হ্যাংম্যানও তো আছে– মধু দাস বা মধু ডোম একনম্বর পাকা ফাঁসুড়ে।

মধু কিন্তু জেলের মাস-মাইনের কর্মচারি নয়। প্রতিটি ফাঁসির জন্য সরকার থেকে সে বত্রিশ টাকা ফি পায়। এবং ফাঁসি দেওয়ার কাজটা বংশানুক্রমিকভাবে চলে আসছে। একাজ তার কাছে শিল্পের মর্যাদাযুক্ত। তাই সে অন্য ডোমেদের মত অবসর সময়ে নর্দমা পরিষ্কার করা বা শুয়োর পালনের ডোমসুলভ বৃত্তিগুলো করতে চায় না। ফাঁসি দেওয়া ভিন্ন অন্য কাজ তার কাছে ছোট কাজ, নোংরা কাজ!

এদিকে দিনকালের পরিবর্তনের সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন (স্বাধীনতা লাভ) হওয়ায় মধুর জীবনেও পরিবর্তন আসে। বহুদিন পরে তার সঙ্গে দেখা হলে অভাবদীর্ণ মধুর গলায় আক্ষেপের সুর ফুটে ওঠে:

–'আজকাল ফাঁসিই হয় না। আগেকার কালের সেই সব ছোকরা হাকিম তো আর নেই। তাদের বুকের পাটাই ছিল আলাদা। খুন প্রমাণ হলেই ফাঁসি। এখনকার এই বুড়ো জজবাবুদের সে সাহসই নেই।

ফাঁসি না হলে মধুর কাজ থাকে না। কাজ নেই তাই বলে একসপার্ট হ্যাংম্যান মধু দাস শুয়োর চরাবে, মর্গের লাশ কাটবে, নর্দমা সাফ করবে, এসব সে ভাবতেই পারে না। দিনের পর দিন বাড়িতে উনুনে হাঁড়ি চড়ে না, অথচ মর্যাদায় ঘা লাগে এমন কাজ সে-ই শুধু নিজে করবে না তা নয়, বৌ-ছেলেকেও করতে দেয় না। ছেলেকে জোর করে নর্দমা পরিষ্কারের কাজে পাঠিয়েছে শুনে নিজের বৌকে রাগে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চ্যালাকাঠ নিয়ে পিটিয়ে মারে। তারপর নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেয়। বৌকে খুন করেছে সে, আর খুনের সাজা ফাঁসি। নিজেকে সেই শাস্তিই দেয় মধু হ্যাংম্যান!

জীবনে অনেক ফাঁসি দিয়েছে হ্যাংম্যান। শেষ ফাঁস পরিয়ে দিল নিজের গলায়। দামী ম্যানিলা রোপ আর কোথায় পাবে? নট-ফটের ঝঞ্ঝাটও ছিল না। বৌয়েরই একটা ছেঁড়া শাড়ি পাকিয়ে দড়ি বানিয়েছে এবং গলায় পরে ঝুলে পড়েছে।'

গল্প শেষ হবার পরেও হ্যাংম্যান মধুর স্বাভিমান আর তার পরিণতি পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে।

একা এক গভীর মনস্তত্ত্বমূলক গল্প। জরাসন্ধের গল্পের পরিচিত ঘরানা

থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। *একা* গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নব্বই বছরের বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়বাবু। একেবারে রুটিনবাঁধা জীবনযাপনে সংযত থাকেন বলে কোন ধরনের অসুখে না ভুগে এই পরিণত বয়েসেও শরীরটাকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ রাখতে পেরেছেন। তার দিনের সবকিছুই নিয়মের নিক্তিতে বাঁধা। নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। এমনকি তাঁর আদরের নাতনির বিয়ের দিনও তাতে নড়চড় হয় না– বাড়িতে বিয়ের ধূমধাম ও অনুষ্ঠান চললেও তাঁর ঠিক রাত্রি নটায় শুয়ে পড়া, ভোর পাঁচটায় ছানা আর ফল খাওয়া, সাতটায় জলখাবার, আর নিক্তি মেপে দুপুরের আহার। একফাঁকে নতুন নাতজামাইকে শুধু শতায়ু হবার আশীর্বাদ করেছিলেন। বললেন:

'এই যে তোমাকে বললাম, একশ বছর বেঁচে থাকো; তুমি ভাবছ ওটা একটা কথার কথা; অনেকেই বলে থাকে। আসলে কিন্তু তা নয়। একশ বছর বেঁচে থাকা এমন কিছু কঠিন নয়, ইফ্ ইউ অনলি নো দি আর্ট ওব্ লিভিং। মুখে যে যাই বলুক দীর্ঘজীবন পেতে চায় সকলেই; কিন্তু কী করে পেতে হয় সে রাস্তাটা খুব কম লোকের জানা আছে।'

পঁচাত্তর বছর বয়েস পর্যন্ত ট্রেজারি গিয়ে নিজের পেনশন নিজেই তুলেছেন। সেখানে অফিসের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হত, ভালই লাগত। তারপর ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পেনসনের টাকায় লেনদেন করতে ছেলে-নাতিরা বাধ্য করাতে আর নিজে যেতেন না। নব্বই পেরোতে পনেরো বছর পরে একবার প্রাত্যহিক যাপনের নিয়ম বদল করে বেরোলেন। অনেকদিন পরে বাইরের জগতের রাস্তাঘাট, বাড়িঘরগুলোকে যেন নতুন রূপে দেখলেন। কচিপাতার শ্যামলিমায় ভরে উঠেছে গাছপালা। বসন্তের মাতাল হাওয়ায় নতুন জীবনের স্পন্দন আর স্পর্শ। নিজের মধ্যেও একটা সজীব প্রাণচাঞ্চল্য অনুভব করলেন যেন। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর পৃথিবী বড় সুন্দর আনন্দময় বলে মনে হল। মনে হল 'বেঁচে থাকার মধ্যে আনন্দ আছে।'

কিন্তু একটা প্রবল মানসিক ধাক্কা খেলেন ট্রেজারি অফিসে এসে। সমসাময়িক বন্ধু-পরিচিতদের একজনও আর জীবিত নেই। কেমন যেন দমে গেলেন। বাড়ি ফেরার পথে কেবলই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল– 'সবাই চলে গেছে, পড়ে আছেন তিনি একা'! এই ভয়ঙ্কর একাকীত্ববোধটা তাঁকে এক সীমাহীন প্রশ্নচিহ্নের সামনে এনে দাঁড় করালো। এভাবে স্বার্থপরের মত বাঁচায় সার্থকতা কী? কী লাভ এই দীর্ঘজীবনে?

ব্যস! উপলব্ধির এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পৌঁছে পরের দিন থেকে মৃত্যুঞ্জয়বাবু সব নিয়মকানুন তুলে দিলেন। সেজছেলের বউ (সকলকে দায়িত্ব ও তাঁকে দেখাশোনা করার দায়ভার বণ্টন করে দিয়েছিলেন) বিকেল পাঁচটায় ঘড়িধরে বৈকালিক আহার্য নিয়ে উপস্থিত হতে তিনি ফিরিয়ে দিলেন নির্দিষ্ট সময়ের খাবার ডিশ্। এমন ঘটনা এই প্রথম! সেজ বৌমা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করল:

'শ্বশুরের মুখে জরা ও ক্লান্তির চিহ্নগুলি হঠাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার উপরে কিসের একটা ছায়া।'

না, মারা যাননি মৃত্যুঞ্জয়বাবু, কিন্তু সেদিন থেকে তিনি যেন জীবন্মৃত হয়ে গেলেন– অন্তর থেকে বাঁচার ইচ্ছেটাই তাঁর একেবারে নষ্ট হওয়ায় তিনি মৃত্যুকে আহ্বান করতে লাগলেন, বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত একা বেঁচে থাকা তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেল!

কলেজ জীবনে অর্থাৎ ছাত্রাবস্থায় তিনি ছোটদের জন্যও প্রচুর লেখালিখি করেছেন। অনেকগুলি শিশুতোষ গল্প-সংকলন প্রকাশিতও হয়েছিল। *গল্প সমগ্রতে* বেশ কিছু তেমন কিশোরদের জন্যে লেখা গল্প সংকলিত আছে। সে-সব গল্প শিশুই শুধু নয় তাদের বাবা-মাও পড়তে ভালবাসতেন। জরাসন্ধ ইচ্ছে করলে শিশুসাহিত্যিক হিসেবেও খ্যাতিমান হতে পারতেন। কিশোরদের উপযোগী গল্পের ক্ষেত্রেও তিনি কৌতুকপ্রদ কাহিনি লেখার দিকেই নিজেকে মোটিভেট করতে ভালবাসতেন। তেমনই দুটি কৌতুকরসের কিশোরপাঠ্য গল্পের উজ্জ্বল উদ্ধার করা হল এখানে।

পুরস্কার গল্পে দেখা গেল মলয়বাবু নামে গৃহকর্তা মানুষটি বিড়ালকে দেখতে পারতেন না, একটা অহেতুক জাতক্রোধ ছিল। হঠাৎ একদিন দেখলেন তাঁর বাড়িতেই একটা বেড়ালের বাচ্চার আবির্ভাব ঘটেছে। তখন চাকরকে আদেশ দিলেন বস্তাবন্দী করে বিড়ালকে বিদায় করতে। কিন্তু তাঁর মেয়ে আন্নাকালী বেড়াল বাচ্চাটাকে আদৌ ফেলতে দিতে রাজি নয়। লুকিয়ে ঝুড়িচাপা দিয়ে বাচ্চাটাকে বড় করতে লাগল সে। বেড়াল বড় হবার পর এক কাণ্ড ঘটল– মলয়বাবুর পাত থেকেই বেড়ালটি একদিন মাছের মুড়ো তুলে নিয়ে দে ছুট। মলয়বাবু বেড়ালের পুনরাবির্ভাবে প্রথমে হতচকিত হলেও অসম দৌড় প্রতিযোগিতায় সকলকে অবাক করে বামালসমেত পাকড়াও করলেন বেড়ালকে। তারপর একহাতে মাছের মুড়ো, অন্যহাতে বেড়ালের মাথা চেপে ধরে বাড়ি ফিরলেন। মারাই পড়ত বেড়ালটা– কিন্তু হঠাৎ একটি বিজ্ঞাপনে দেখলেন জনৈক ব্যারিস্টার দাস মেয়ের বেড়াল হারিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করে পুরস্কারের কথা লিখেছেন। তিনি ব্যারিস্টারের কাছ থেকে বেড়ালের ছবি আনিয়ে নিজের বাড়ির বেড়ালটিকে চিত্রিত করে, সেই বেড়াল তাঁকে গছিয়ে পুরস্কার নিয়ে এলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না, জলে ধুয়ে রং উঠে যাওয়া ব্যারিস্টারের মামলায় মলয়বাবুকে পুরস্কার ফেরৎ দেওয়া ছাড়াও অনেক টাকা গুনাগার দিতে হয়েছিল। সেই রাগে তিনি বড় দু'বোনের বিয়ে না হলেও ছোটমেয়ে সাতবছরের আন্নাকালীকে বিয়ে দিয়ে দেবার বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কাগজে, যাতে একমাত্র শর্ত ছিল পাত্রের বাড়ি হবে বর্মা কিংবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ! বেড়ালের জন্য এই বনবাস।

আরও কৌতুককর গল্প *টেলিফোনের কবলে*। বাড়িতে নতুন টেলিফোন এসেছে। কিশোর কমল সেটি ব্যবহার করতে উদগ্রীব। কিন্তু বড়রা থাকলে সে সুযোগ হয় না তার। তখন গরমের ছুটি চলছিল। দুপুরের দিকে বড়রা না থাকায় কমল চেনা-অচেনা সকলকে টেলিফোন করে পাগল করে তুলল। তার সঙ্গে আবার যুক্ত হল তার প্রতিশোধ স্পৃহা। যে কেউ কমলকে বকাবকি করলে কমল উড়োফোন করে তার বদলা নিতে শুরু করল। ঘনশ্যামবাবুর বাগানে লিচু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল কমল এবং শাস্তি পেতেও হল। পরের দিনই ডাক্তার সান্যালের কাছে ফোন গেল, ঘনশ্যামবাবুর মাথার অসুখ একবার যেন তিনি দেখে যান। ডাক্তার চলে এলেন, ঘনশ্যামবাবুর চিৎকার-চেঁচামেচিকে তিনি মানসিক রোগেরই লক্ষণ মনে করলেন। ইতোমধ্যে এরকমই উড়ো ফোন পেয়ে অ্যাম্বুলেন্সও এসে হাজির। ঘনশ্যামবাবুকে প্রায় বেঁধে ধরে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাবার সময় তাঁর স্ত্রীকে ডা. সান্যাল সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন, 'আপনি ভাববেন না মা, আপনার স্বামীর চিকিৎসার কোন ত্রুটি হবে না।'

কাকা বকেছিল একদিন কমলকে। কাকা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। সেখানে খবর গেল ব্যাঙ্কে ডাকাত পড়বে। কাকা পুলিশে খবর দিলেন ভয় পেয়ে। পুলিশ সমস্ত দিন হন্যে হয়ে থেকে কাকাকে গালাগাল দিতে দিতে ফিরে গেল। এই রকমই চলছিল, হঠাৎ একটি ঘটনায় ব্যাপারটা বন্ধ হল। 'আপনার ছেলেকে কুকুরে কামড়েছে, শিগগির আসুন', এই ফোন করার ঘণ্টাখানেক পরে লোকজন এসে জোর করে কমলকেই হাসপাতালে নিয়ে গেল। তারপর পটাপট পেটে পাগল কুকুরের কামড়ানোর বিশাল দুটি ইনজেকশন– কমলের আপত্তির কথা কেউ শুনল না। ফোন করার সময় এমন পরিণতির কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি!

আসলে, ফোনটা ভুল করে বাবার কোর্টে করেছিল কমল। বাবাই ব্যবস্থা করেছিলেন সব।

জরাসন্ধ এক কুশলী গল্পলেখক। মানবমনের জটিল মনস্তত্ত্বের বিচারে, ভাবনার নিবিড় উন্মোচনে, চরিত্রচিত্রণের নিপুণ সামর্থ্যে তিনি এযুগের একজন দক্ষ ও শক্তিশালী কথাকার হিসাবে স্বীকৃত হতে পারেন। *লৌহকপাট* উপন্যাসের জন্যই জরাসন্ধের অজেয় জনপ্রিয়তা। এই সহসা জনপ্রিয়তাই জরাসন্ধের পক্ষে অন্যদিকে অভিশাপ হয়েও এসেছে, কারণ রাতারাতি তিনি বিখ্যাত এবং চিহ্নিত হয়ে গেলেন কারা-সাহিত্যিক হিসেবে। কিন্তু কারাগারের বাইরের জগৎ এবং মানুষদের নিয়েও তিনি অনেক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস এবং গল্প লিখেছেন। যে মানুষের কাছে বিষয়ের চেয়েও মূল্যবান ছিল রচনাকৌশল, যিনি মানবমনের গভীরে অবগাহন করতে পারতেন, সরস ভঙ্গি যাঁর ছিল সহজাত ক্ষমতা, তাঁকে আমরা বন্দী করে রাখলাম কারাগারের কালো গরাদের প্রহরায়, সাহিত্যের মুক্তাঙ্গনে তাঁকে যোগ্য সমাদরে বসানো হল না, অথচ সে সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল এবং এক সার্থক কথাশিল্পী হিসেবে তিনি সে দাবি করতেই পারেন– এই আধুনিক অথবা উত্তর-আধুনিক কালেও।

বাংলা কথাসাহিত্যের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে জরাসন্ধের সাহিত্যকৃতির বাস্তব মূল্যায়নের প্রয়োজন আজ বিশেষ জরুরি বলেই মনে হয়।

জ্যোতির্ময় দাশ কবি, প্রাবন্ধিক, *পদক্ষেপ* সম্পাদক

BE 100% SURE

Dettol

BPMPA

Proud Partner of icddr,b

ডেটল সাবান সুরক্ষা দেয় ১০০ রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত যে নতুন ডেটল সাবান আপনার পরিবারকে ১০০টি পর্যন্ত রোগবাহী জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়। এজন্যই ডাক্তাররা সবসময় পরামর্শ দিয়ে আসছেন ডেটল ব্যবহার করার জন্য।

নতুন

সুরক্ষা দেয়

১০০

রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

This is supported by Microbiological assessments versus bacteria and fungi at an external GLP facility (Bioscience Laboratories, Bozeman, Montana, USA)

** Dettol Original Soap is a Grade-1 soap

DettolBD

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা

সালেহা চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

উনত্রিশ.

ফরিদপুর কি অসহ্য হল? পরদিন পান্না ঠিক করল কিছুদিনের সে বোনের বাড়ি ময়মনসিংহ যাবে। একটু বিরতি চাইছিল। যাকে সকলে বলে 'ব্রিদিং স্পেস'। আপাতত কিছুদিন পাপিয়া আপার বাড়িতে। দুলাভাই সিভিল সার্জন। দু'জন কিশোর-কিশোরীর মা পাপিয়া আপা। বুঝবার উপায় নেই। সুখ থৈ থৈ, সুখ টইটুম্বর গোলমুখ। লাল ঠোঁট পানের রসে রসাল। বেড়াতে-টেড়াতে যাবার সময় সে ঠোঁট হয়ে লাল টুকটুকে। লিপস্টিকের রসে। গিন্নীবান্নি একটু লাগে বটে। না হলে একেবারে বনলতা সেন। বনলতা পাপিয়ার আরেক নাম। সেটা অবশ্য এ বাড়ির কারো দেওয়া নয়। পাড়ার এক হতাশ প্রেমিক চিঠিতে এই নামে ডেকে দু'পাতার কবিতা-কাদায় থিকথিকে চিঠি লিখেছিল। না আছে ছন্দ, না জানে ভাষা। নিজের ঘরের দরজায় কঁদের আঠা দিয়ে সেই চিঠি লাগিয়ে প্রেমিকের মুণ্ডু দাবি করেছিল পাপিয়া ওরফে আজমিরী বানু। মা খুশি, বাবা খুশি। পান্না তখন অনেক ছোট। মুণ্ডু না হলেও ছেঁড়া শার্ট এনে উপহার দিত পাপিয়াকে। পারেনি। স্কুল ছাত্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এখন দুলাভাই সিভিল সার্জন। শ্বশুরের খরচে ডাক্তারি পড়ে, শ্বশুরের তদবিরে কয়েকজনকে ডিঙিয়ে একেবারে গাছের মাথায়। আব্বাজানের আপন ভাগ্নে একবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। সে সময় দুলাভাইয়ের ভাগ্য বদলে গেল। আব্বাজান বলেন তকদির এবং তদবির দুই-ই দরকার। এখানে তকদিরের চাইতে বেশি উপকার করেছিল তদবির। যেমন দোওয়া আর দাওয়া। আর পাপিয়া বলে ওর ভাগ্যেই এমন হল। ওর ভাগ্যবল তাইতে ওদের সংসার এমন উজ্জ্বল করেছে। দুলাভাই সুখী মানুষ। যে সব মানুষ সুখী হবার জন্য মাছের ঝোল খেয়ে বলেন– আজ আমি মাছভাত খেয়েছি, দুলাভাই তাদের দলে। হাঁসের মত সুখটুকু ছেঁকে নিতে পারেন। যখন-তখন গয়না গড়ানো, প্রতি সপ্তাহে শাড়ি কেনা, ঈদে পরবে সিতাহার, ব্রেসলেট আর্মলেট।

আর পাপিয়া প্রতিদিন বিকালে মুখে স্নো ঘসে, কপালে লাল টিপ কেটে দুলাভাইয়ের সামনে চায়ের পাত্র হাতে হাজির হন।

কি গো কি চাই এ সপ্তাহে? এমনি আদর-আদর কণ্ঠে বউতোষণ চলে তার। পাপিয়া গালে টোল ফেলে বলে– পরে বলব। পরে অর্থাৎ রাতে। মশারির তলে, প্রেমময় সময়ে।

স্ত্রীকে কাছে নিয়ে ঘুমোতে পারেন এবং পাপিয়াআপা রাঁধতে পারে অনেক পদ। এরপরেও দুলাভাই অভিযোগ করবেন? মোটেই না। তিনি এত বেশি কবি-সাহিত্যিক নন যে সময় বিশেষে স্ত্রীর উঁচু গলাকে প্রেমে বাধা, এমন ভাববেন। প্রেম দেখাতে রাতে তিনবার ভালবাসেন স্ত্রীকে। আর পাপিয়াআপা এত সুখের পরেও ঘাসের ঘ্রাণের মত অখ্যাদ্য নিয়ে ভাববে, কে যেন তাকে বনলতা বলেছিল সে নিয়ে ছলছল হবে? মশকরার একটা সীমা থাকা উচিত। যাকে ইংরাজিতে বলা হয় 'ইউ মাস্ট বি জোকিং।'

এই প্রেমময় বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসে বেঁচে যায় পান্না। আব্বাজানের ব্যবসায় দেখতে এবার কোমর বেঁধে নামার পালা। তার আগে একটুক্ষণ নিশ্বাস ফেলার সময়। যে মেয়েটি ওর কৈশোর থেকে যৌবন এনেছিল, যে মেয়েটি তাকে কবি ও অনুভূতিপ্রবণ করেছিল তাকে ভোলা একটু কঠিন মনে হল কি? কে বলবে। কিন্তু গোনাগুনতিতে কতগুলোই বা কথা হয়েছে তার সঙ্গে। খুব বেশি নয়। কিন্তু মেয়েটির অস্তিত্বে সুরভি এবং বেদনা– দুই-ই ছিল। ভাবলেই তো হয় এখনো মেয়েটি আছে 'নিরিবিলি'র বড় গাছের নিচের ঘরটিতে। কিন্তু ভাবা যায় না। কারণ এই ভাবনায় যেটুকু প্রত্যাশা তার সবটুকু শিকড়শুদ্ধ উৎপাটিত। এই ভাবনায় দহন কষ্ট যন্ত্রণা। এখন বি এ পরীক্ষায় প্রথম হলেই বা কি এসে যায়। কিছুই না। পান্না রেলের জানালায় বসে এসব ভাবে। আর পাপিয়া আপার আদর-যত্নের ভেতরও এইসব। ভাবে লঞ্চ ভাড়া জুটলেও ফরিদপুর থেকে ঢাকা যাওয়া এমন কি কঠিন। কিন্তু কোথায় যাবে পান্না। কার বাড়িতে?

সেকি তবে বিরহে বিবাগী হল? এমন ভাবনাতেও বিরক্তি। এইসব ভাবনা থেকে মুক্তি পেতেই কি অগস্ত্যযাত্রার মত ময়মনসিংহ যাত্রা? হয়তো।

দিব্যি একখানি ঘর সাজিয়ে দিল পাপিয়া আপা। জানালাঘেঁসে টেবিল। সেখানে লেখার কাগজ। বিবিধ নধর কলম। শুধু হৃদয়ে ডোবালেই হল। আর জানালার পাশে বেশ কাজকরা একখানি চেয়ার। যে চেয়ারে বসে জানালা এবং আকাশ দুই চোখে পড়ে। মনে ধরে। সিভিল সার্জেনের বিশাল চত্বর। শাল, জাম, মহুয়া, বকুল, শেফালির এক সুবিশাল সমাবেশ। এ এক অভাবনীয় আশ্চর্য রূপসী বাংলা। আর আয়নার আলমারি, কাজটাজ করা দামী খাট। পর্দার রঙ টলটলে ফিরোজা। সেগুন কাঠের আসবাব সবগুলো। পাপিয়া বাপের বাড়ির একজনকে অনেকদিন পর পেয়ে নিজের সুখ ও ঐশ্বর্য দেখাতে জীবনপণ করেছে এমনইতো মনে হয়। ঘরে ঢুকে বলে– সব ঠিক আছে তো পান্না?

বিলকুল ঠিক। এ যে একেবারে রাজসমারোহ। পাপিয়া খাটে পা ঝুলিয়ে বসে। জানালার দিকে তাকিয়ে বলে– আমি অবশ্য খুব বেশি জানালায় দাঁড়াই না। কারণ দাঁড়ালেই দু'একজন কয়েদি চোখে পড়ে। সিভিল সার্জনের বাড়ি বুঝতেই পারছিস। এসব কয়েদিরা অনেক কাজ করে দেয়।

এই হল পাপিয়ার আসল চেহারা। প্রকৃতি দেখব না ওইসব বিদঘুটে মানুষদের কারণে। পান্না বলে– দারুণ বাগান। আর এতসব গাছপালা। ইস আগে কেন আসিনি এখন ভাবছি।

এবারে এসেছিস তিনমাসের আগে যাওয়ার নাম করবি না। এই বলে পাপিয়াআপা রান্নাঘরে চলে যায়।

লেখার টেবিলে বসে সেই সব বাহারি খাতায় সুন্দর হস্তাক্ষরে আপনমনে নানা কিছু লিখতে গিয়ে দেখে লেখাগুলো দোয়াতের জমাট কালির মত স্রোত হারিয়ে ফেলেছে। একেবারে এঁদো ডোবা। উঠে আসে টেবিল থেকে। তার আগে পাপিয়াআপা এক প্লেট গরম ফুলুরি ভেজে ঘরে ঢুকেছে।

কি লিখছিস?

কিছু না। বলে পান্না। –কি আর লিখব। এখন লেখাটেখা সব বাদ। এখন খাব আর ঘুমাব।

আগে তো ভাল পদ্য লিখতি। এখন ছেড়ে দিয়েছিস সে-সব?

ঠিক ছাড়িনি। তবে মনে হচ্ছে সিভিল সার্জনের বাড়িতে এসে কবিতার ভাইরাল ইনফেকশন চলে যাচ্ছে।

পাপিয়া হাসে। –একেবারে আগের মত আছিস। তবে ভাইরাল ইনফেকশন ছেড়ে যাবার কি দরকার? এই সব গাছপালা, লেখা বন্ধ করিস না।

দেখা যাক। এই বলে পাপিয়ার হাত থেকে প্লেট নেয় পান্না। গরম গরম ফুলুরি মুখে পোরে। বলে– এবারে মচমচে এক কাপ চা চাই যে পাপিয়াআপা।

চা আসছে।

রাতে জমিয়ে তাস খেলা হয়। প্রায়ই ব্রে। প্রায়ই পান্না গাধা হয়। দুলাভাই বলে– তাতে কি? জান না কার্ডস অলওয়েজ ফেভার দ্য ফুল।

তার মানে আপনি দি ফুল?

হান্ড্রেড পার্সেন্ট। এই বলে দুলাভাই হা হা করে হাসেন। সকলেই হাসে।

তারপর যখন আকাশে জ্যোৎস্না নামে, আকাশে মেঘ হয়, বড় বড় গাছের পাতায় বিষ্টি আটকে থাকে, ফুলেরা সব ফুটে উঠে বলে আমাদের ভালবাসো, তাদের জন্য কেবল পান্না উদাস হয়। বেদনার্ত হয়। আবার পাপিয়াআপা গরম জিলাপি, সিঙাড়া এনে সামনে ধরে। ব্রের আসর না হলে দাবা– সবাই জমে বিপুল আনন্দে। আর কিশোর-কিশোরী ভাগ্নেভাগ্নিরা হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় এই দুর্লভ মামাটিকে তাদের নিজের ঘরে। নিজেদের খেলার জগতে। ষোল বছরের মহুয়া আর পনের বছরের শিহাব। বন্ধুত্ব হল ওদের সঙ্গে। দুঃখ পোটলায় বেঁধে বনে গেলে কি হয় কে বলবে কিন্তু পাপিয়া আপার বাড়িতে এই সব দুঃখ দিয়ে আর যাই হোক দুঃখের বংশ বৃদ্ধি হয় না। সবগুলো দুঃখ কোথায় যে চলে যায় সময়বিশেষে বোঝাই যায় না। যার হাত ধরে শোনান হল না কোন প্রেমের কবিতা, যার চুলের ঘ্রাণ জানা হল না কিংবা জানা হল না অনেককিছু তাকে নিয়ে কতকাল বিরহী হয়ে থাকবে ও। কতকাল? সময়ই বলে দেবে সে কালের হিসেব।

আপাতত পরস্পর-বিরোধী বোধে সাম্পান ভাসানো।

ত্রিশ.

বিকালে চা মুড়ি খেল কাজল। ক'দিন হল মিঠুপার চেয়ারে মিঠুপার ভঙ্গিতে বসে কতকিছু ভাবল ও। বড় হতে চাইল মিঠুপার মত। কিন্তু ও জানত না হাজার চেষ্টা করলেও কেউ রাতারাতি বদলাতে পারে না। এবং ও কোনদিন মিঠুপা হতে পারবে না। তবু বিকাল বেলা মিঠুপার মুখ দেখবার আয়নায় কপালে টিপ কেটে রওনা দিল পারুলদের বাড়ি। কিন্তু যাবার আগে মাকে বলতে ভুলে গেল না। – মা আমি একটু বাইরে যাব। মা একটু অবাক হয়ে দেখে। যে মেয়ে দিনে দশবার হুটহাট করে বাইরে

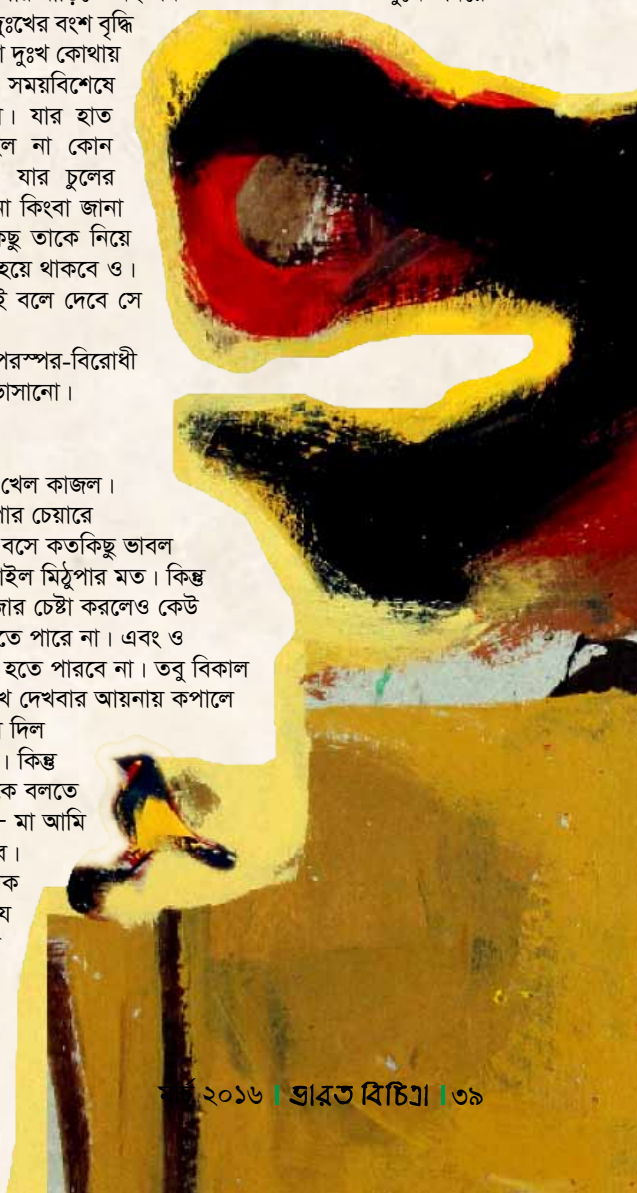

যায় সে আজ বাইরে যাবার অনুমতি চাইছে। –কাজল ভাল হয়ে থাকিস। মিঠুপার মতে যা ভাল হয়ে থাকা তাই সে করতে চাইছে বুঝতে পারল। এমনকি জায়নামাজ পেতে নামাজ পর্যন্ত। দুলাভাই বলেছিলেন– কাঠবেড়ালির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাছে- টাছে উঠিস না। সে কথাও মনে আছে ওর। এখন তাই মাঝে মাঝে ডালে বসা কেবল। দুলাভাই বলেছিলেন 'প্রসেস অফ ইলিমিনেশনে' শুদ্ধতম কাজল। হয়তো একদিন ডালেও আর বসবে না। দেখা যাক কতখানি শুদ্ধতম হওয়া যায়।

রাস্তা ধরে চলতে গিয়ে আজ দু'পাশের গাছগাছালি, পাখপাখালি, মানুষ, দোকান কিছুই না দেখে ভাবছে কখন পান্নার সঙ্গে দেখা হবে। মাঝখানে তিনদিন চলে গেছে। কাজল বাড়ি থেকে বেরোয়নি। মিঠুপার কথা মনে রেখেই হয়তো বেরোয়নি। বোধকরি মিঠুপার শোকে। একটা মানুষ বেঁচে থেকেও কেমন করে দূরের হয়ে যায়। এখন ওর নতুন ঠিকানা, নতুন পরিচয়। ওকে এখন হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় না। রাস্তার আইসক্রিমওয়ালার প্রিয় সুর ওর চিন্তা থেকে ফেরাতে পারে না। অনুভব। আমি আজ পান্নাকে দেখব। কেবল দেখার জন্য এমন করে আকুল হয় মানুষ কে কবে জানত।

কাজল আস্তে আস্তে হেঁটে পারুলদের মাধবীর গেট পেরোয়। চেয়ে দেখে সুনসান খেলার মাঠ। আজ কেউ আসেনি ব্যাডমিন্টন খেলতে। কেউ বসে নেই বেতের চেয়ারে সামনে টেবিল রেখে। টেবিল-চেয়ারগুলো পর্যন্ত অদৃশ্য। কাজল ধীরে ধীরে ভেতর বাড়িতে যায়। খালাম্মা আছর পড়েছেন। একই অজুতে মাগরেব পড়বেন বলে হাতে তসবিহ নিয়ে পায়চারি করছেন বারান্দায়। কাজলকে দেখতে পেয়ে হেসে বলেন– পারুল ছাদে।

সিঁড়ি ভেঙে ছাদে ওঠে কাজল। –বাবা এতদিন পরে? জানায় পারুল।

তিনদিন মাত্র। তুইও তো তিনদিনে আমার খোঁজ করিসনি।

আব্বাজান বাড়িতে। কোমরে ব্যথা। কোথায় বেরুব তার উপায় আছে।

তাই বুঝি ব্যাডমিন্টন খেলা চলছে না।

না। আপাতত না। যতদিন পান্নাভাই না ফিরছেন সিচুয়েসন ইমপ্রুভ করছে না।

যতদিন না ফিরছেন মানে? কোথায় গেছে ও? একটু হাহাকার বাজল কি কাজলের কণ্ঠে? ঠিক বোঝা যায় না।

ও আপনি তাও জানেন না। পারুল ওড়না টানে। ছাদে বেশ বাতাস। বলে– পাপিয়াআপার বাড়ি ময়মনসিংহ। ঠাট্টা করে আবার বলছিল 'মাই মেন সিংগ্' আমার মানুষেরা গান করে। আপাতত ওখানে চললাম। বুঝতে পারছিস না কেন?

কেন?

ছ্যাঁকা।

কিসের ছ্যাঁকা?

এত গাধার মত কেন কেন করিস না তো। মিঠুপা নেই। বরের বাড়ি গেছে। ছ্যাঁকা খাবে না।

কাজল পারুলকে দেখে।

পারুল প্রসঙ্গ অন্যদিকে বদলায়। বলে– মমতা ও পবিত্র এসেছিল। চলে গেছে। জানিস তো আপাতত দু'জনে প্রেম করছে।

কাজল কেবল তাকিয়ে পারুলকে দেখে। কথা বলে না। এ বাড়ির ছাদে নারকেলগাছ নেই। পেয়ারাও নয়। সব ধূ ধূ খোলা। কোথাও কিছু নেই। কেবল ছাদ আর আকাশ। পারুল বলে– কি ব্যাপাররে কাজল তখন থেকে এত চুপচাপ যে?

কিছু না। এই বলে ছাদের কার্নিস ঠেঁস দিয়ে দাঁড়ায় ও। পারুল চেয়ে দেখে কাজলকে। চোখে কাজল। কপালে কুমকুমের টিপ। মিষ্টি পাউডার। মিঠুপার বিয়েতে পাওয়া গোলাপি জর্জেটের জামা গায়ে। ওড়নাটি গলায় পেঁচানো।

–এত সাজুগুজু? ব্যাপার কি?

কি আবার এত সাজগোজ। পারুল বলে– চল ঘরে গিয়ে সাপলুডো খেলি।

কাজল বলে– না থাক। এখানে থাকি।

পারুল বক বক করে অনেক কথা বলে। বোঝা যায় ওর আব্বাজান ওর জন্যে বর দেখতে শুরু করেছেন। কোনমতে ষোল-টোল হলেই গলায় ছুরি। সে নিয়ে পারুলের মাথা ব্যথা নেই। বরং এসব বলতে বেশ একটু খুশি খুশি গলা ওর। একসময় পারুলের কথার ফাঁকে কাজল বলে– পান্নাভাই কবে ফিরবেন?

তিনমাসের আগে না। বলেই আবার আগের গল্পে ফিরে যায়।

তিনমাস? এতদিন?

ঘা শুকোতে সময় লাগে। সার্জন দুলাভাই মলম-টলম লাগাবেন, পাপিয়াআপা ব্যান্ডেজ বাঁধবেন।

তুই না পারুল সারাক্ষণই এই ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি করছিস। মানে পান্না আর মিঠুপার প্রসঙ্গ নিয়ে।

কি করব তাহলে?

তাই বলে কেবল হাসাহাসি?

গাধাদের এমনই হয়। এই বলে পারুল ওর এক ভবিষ্যৎ বরের গল্প ফাঁদতে যাবার আগেই কাজল সোজা নেমে আসে। নিচের মাঠে নামতেই উপর থেকে চিৎকার শুনতে পায় কাজল– অমন রাগ দেখিয়ে যাবার কি হল?

বাড়িতে কাজ আছে। এই বলে কাজল বাড়ির পথ ধরে। মনে পড়ে পান্নার কবিতা–বিষ্টি পড়ে বিষ্টি/ চলে গেছে মিষ্টি মেয়ে/ একি অনাছিষ্টি।

কাজলের মন পান্নার জন্য কেমন হল এখন ও বুঝতে পারে। ভয়ানক কেমন। ও ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে না। যেন ও রাতারাতি মিঠুপার চাইতে বড় হয়ে গেছে। যেসব মেয়েরা বেদনা বোঝে তেমনি কোন প্রাজ্ঞ মেয়ে আজ কাজল। পথে ফিরতে দেখা হয় পবিত্রর সঙ্গে। চুপি চুপি সিগারেট কিনছে। কাজলকে দেখে বলে– কি রে কাজল। কাজল হাসে। তারপর একেবারে সোজা নিজের ঘরে।

ব্যতিক্রমের মত সে রাতে ভাত খায় না। কাজল কখনো না খেয়ে থাকে না। যত রাগ আর দুঃখই হোক না খেয়ে কখনো সে থাকেনি। আজ ওর মনে হয় গলা দিয়ে ভাত নামবে না। কেন মনে হয়? কাজল কি করে বলবে।

ভাত খাবি না কেনরে কাজল?

গলায় ব্যথা।

তোর তো কোনকালে টনসিল ছিল না। মা একটু অবাক হন।

গলাব্যথা টনসিল না থাকলেও হয়।

মা আর কিছু বলেন না। কাজল অন্ধকারে কী ভাবে কে জানে?

একত্রিশ.

ওর নাম টিয়ামামা। ঘরে এসে মহুয়া টিয়ার সঙ্গে ভাব করিয়ে দেয়। পান্না বই পড়ছিল। উঠে বসে। বলে– আমার সবচাইতে দুটো প্রিয় নাম মহুয়া আর টিয়া। টিয়া তুমি কোন ক্লাশে পড়?

টিয়া হেসে বলে– নাইনে।

ক্লাশ নাইন/ করে শুধু ফাইন।

আর ক্লাশ টেন/ বিয়ে করবেন?

বলে মহুয়া।

তাই বলা হবে তোমাদের ক্লাশ টেনে উঠলে।

ইনি আমার মামা।

টিয়া বলে সালাম আলেকুম মামা।

ওয়ালেঅকুম সালাম টিয়া।

ও কিন্তু আমার একমাত্র প্রিয় বান্ধবী।

অতঃপর মহুয়ার একমাত্র প্রিয় বান্ধবীসহ বেশ সময় কাটে। টিয়া, মহুয়া আর পান্না। সেই সব গাছের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নানা কথা, নানা গল্প।

পান্নামামাটা দারুণ মজার। বলে টিয়া।

হবেই তো আমার মামা যে।

ওরা সবাই মিলে খুঁজে পেল কাঠবেড়ালির বাসা। হাতে ধরে খাবার নিয়ে নিজের বাসায় উধাও কাঠবেড়ালি। ভাব করে কাছে আসতে শিখল সেই বিশেষ লেজের কিউট প্রাণীটি। এই সব করতে করতে কেটে গেল দেড়মাস। শিহাব একটু মুখচোরা। লাজুক ছেলে। তাকেও সঙ্গে দিল পান্না। বলল নানা দেশের মজার মজার গল্প। বিজ্ঞানীদের গল্প, আবিষ্কারকদের গল্প। পর্যটকদের গল্প। শিহাব এমনি কিছু হতে চায়। ভবিষ্যতে নাসাতে কাজ করবার ইচ্ছা ওর। পান্না বলল– এই পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। তুমি পারবে।

দুলাভাই ও পাপিয়াআপার সুখের ঝগড়ার মাঝখানে মধ্যস্থতা করবার দায়িত্বও হাসি মুখে মেনে নিল পান্না। ভাব করিয়ে দেবার পর দুজনে যখন সেকেন্ডশোতে সিনেমা দেখতে গেল পান্না ভাগ্নে-ভাগ্নিকে সঙ্গ দিল। *রোমান হলিডে* দেখে ফিরে এসে পাপিয়াআপা বলল– তোর দুলাভাই কেন গ্রেগরিপেকের মত দেখতে হল না?

এ্যান্থনি কুইনের মত। অনেক বেশি ম্যানলি। পান্না হেসে বলল।

তোর তাই মনে হয়?

অফকোর্স তাই মনে হয়। ট্রু কপি অফ এ্যান্থনি কুইন। যাক আরেকজন নামি দামি অভিনেতার সঙ্গে মিল আছে জেনে খুশি হল পাপিয়াআপা। অবশ্য দুলাভাই বলেনি– তুমি অড্রে হেপবার্ন নও কেন।

না এত বেশি ক্রুয়েল তিনি কোন কালেই নন। সন্ধ্যারাণীর সঙ্গে নাকি পাপিয়াআপার মিল আছে এই বলে কানের একজোড়া দুল গড়িয়ে দিলেন ঝগড়া মিটে যাওয়ার আনন্দে। আর মিঠুর স্মৃতি। সেই দূর যাদুপুরের মত কখনো হঠাৎ জানান দেয়। তবে সে নিয়ে তেমন বেদনা? আপাতত নেই। মনে মনে বলে পান্না এই পৃথিবীতে দেবদাস হওয়া ভয়ানক কঠিন ব্যাপার।

বাবুইয়ের বাসা হাতে নিয়ে টিয়া বলে– মামা রাতে আমি এর ভেতর জোনাকি রেখে দেব তা হলে মনে হবে খড়ের ঘরে ইলেকট্রিকের আলো। এই কথাতেই মনে পড়ে গেল কাজলকে। ওদের দুজনার কোথায় যেন মিল আছে। চোখে, না চিবুকে, ব্যক্তিত্বে না আনন্দবোধে ঠিক ধরা যায় না তবু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ঘরে ফিরতেই এক গোছা চিঠির সঙ্গে পেল পারুলের চিঠি। একগোছা চিঠি

পাপিয়াআপাদের। কেবল ওর জন্য একটি চিঠি আছে সে পারুলের। পারুল গোটা গোটা অক্ষরে অনেক কিছু লিখেছে। পারুল গঁদের আঠায় বেহিসাবী। সে চিঠি খোলে সাধ্য কি তার। তবু খোলা হল কোনা-টোনা ছিঁড়ে। চিঠির মাথাও কেটে গেল। তবু উদ্ধার করা গেল যা ও লিখেছে। শেষের দিকের ব্যাক্য এমন। –কাজল চলে যাবে। ওর আব্বা রংপুর বদলি হয়েছেন। আমার মন খারাপ লাগছে। তারপর আরো অনেক কথা লেখা ছিল। আব্বাজান যে পারুলের গায়ে বোরখা চাপাতে চেষ্টা করছেন সেই ভয়াবহ খবর।

পান্না চিঠি রেখে দেয়। কবে যাবে, কোনদিন যাবে তার কোন উল্লেখ কোথাও নেই। সেদিন মনে হয়েছিল ও পথ দিয়ে যেতে এখন আর মন কেমন করবে না। এখন আর মনে হবে না হুঁ হুঁ হাওয়ায় গাছের নিচের কোন ঘরটিতে এখন মিঠু। কি করছে এখন মিঠু। কাজলকে পেয়ে প্রশ্ন করবে না– বল না কাজল কি করছে তোর মিঠুপা।

সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসছে। জানালার ওপারের আকাশে একটি একটি করে অসংখ্য জোনাকি। ফুটে ওঠার শেষ নেই। সারা পৃথিবী এই মুহূর্তে কেমন বদলে যায়। কেমন অন্যরকম হয়ে ওঠে। বিষণ্ণ, উদাস, স্তব্ধ, সুদূর। সেই অন্ধকার আলোতে কাজলের মুখ মনে পড়ে যায়। আমগাছের প্রশস্ত শাখায় পা ঝুলিয়ে, চকলেটে গালের একপাশ ফুলিয়ে উলকাঁটায় সাপের ফণার মত কোন এক মাফলার তৈরি করছে না হলে একটু একটু করে কোন এক ডিটেকটিভ বই শেষ করছে। দুরন্ত চুল উড়ছে বাতাসে। কিংবা হাঁ করে চেয়ে দেখছে গিরগিটির ওঠানামা। আর পান্নার দিকে চোখ রাখতেই হেসে উঠছে। কাজলের সাঁকো বেয়ে পৌঁছে যাওয়া মিঠুর কাছে তেমনি কোন ইচ্ছা। সেই মেয়েটি চলে যাবে? এ কি খুব বড় ঘটনা। পাঁচবছর পরে? ওরা ফরিদপুরে ছিল পাঁচ বছর।

তারাদের ফোটা দেখতে দেখতে পান্না কি ভাবছে নিজেই জানে না। পাপিয়াআপারা সপরিবারে কোথায় যেন গেছে বেড়াতে। খালি বাড়িতে ও একা। তখন গুটি গুটি একটি কবিতা ফোটে খাতায়। এমনি কোনও কবিতা। বিশেষ কেউ নেই সেখানে।

● আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

সালেহা চৌধুরী প্রবাসী কথাসাহিত্যিক

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd, b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

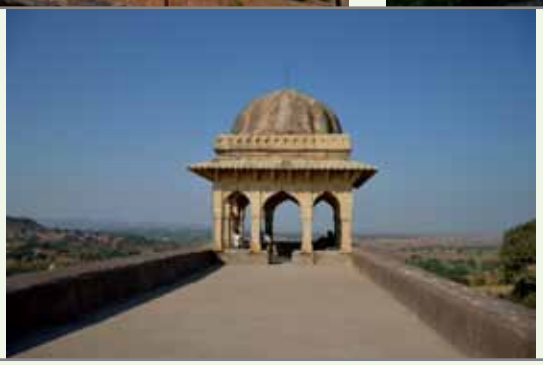

ভ্রমণ

দুর্গনগরী মাণ্ডু

অমিতাভ ঘোষ

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। বিদায়ের পথে ২০১৫। বছর শেষ হওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের মধ্যপ্রদেশ ট্যুরও শেষের মুখে। একে একে খাজুরাহো, অমরকণ্টক, পাঁচমাড়ি, জব্বলপুর, উজ্জয়িনী ঘুরে আমরা সত্যিই খুব আনন্দ পেয়েছি। উপভোগ করেছি প্রতিটি মুহূর্ত। বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত, নর্মদা ও শোন্ নদী এবং সবুজ জঙ্গলে-ঘেরা এই রাজ্য শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেই সমৃদ্ধ নয়, প্রাচীন ইতিহাসেরও অধিকারী। ভারতের এই স্থাপত্য, শিল্প, কারুকার্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত সারা পৃথিবীর মানুষ। তবে মুগ্ধ হওয়ার আরো বাকি ছিল সেটা বুঝলাম আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল মাণ্ডু পৌঁছবার পরে।

মধ্যপ্রদেশের বিন্ধ্যপর্বতমালার গায়ে প্রায় ৬৫০মিটার উচ্চতায় মালওয়া মালভূমিতে অবস্থিত মাণ্ডু হল এক ঐতিহাসিক দুর্গনগরী। লম্বায় প্রায় ৬ থেকে ৮কিমি এবং চওড়ায় প্রায় ৫ থেকে ৬ কিমি বিস্তৃত একটা আস্ত পাহাড়ী শহর যে দুর্গের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। 'কাকরা খো' বা গভীর সংকীর্ণ গিরিখাত পাহাড় ও মালওয়া মালভূমিকে পৃথক করে রেখেছে।

১২টি প্রবেশদ্বার দিয়ে সাজানো এই দুর্গনগরীতে ৭৫টি ঐতিহাসিক সৌধ আছে। সহজেই অনুমান করা যায় সমস্ত সৌধ দেখতে হলে রীতিমত পরিকল্পনা করেই এখানে ঘোরাঘুরি করতে হবে। এখানকার দর্শনীয়স্থানগুলি মোটামুটি তিনটি অংশে বিভক্ত। বাজারের কাছেই রয়্যাল এনক্লেভ অংশ, একদম দক্ষিণে রেওয়া অংশ এবং এই দুইয়ের মাঝে সেন্ট্রাল বা ভিলেজ অংশ।

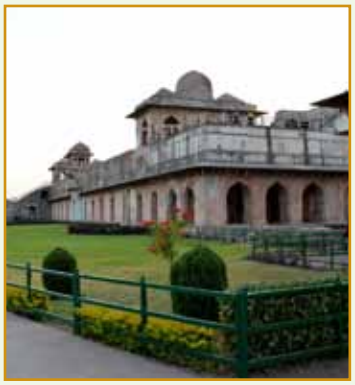

মাণ্ডুর আকর্ষণ শুধুমাত্র ঐতিহাসিক সৌধেই সীমাবদ্ধ নয়। মাণ্ডু হল প্রকৃতি ও ইতিহাসের এক সংমিশ্রণ। একে যেন অন্যের পরিপূরক। একটিকে বাদ দিলে অন্যটিকে ঠিকমত অনুভব করা যাবে না। বিন্ধ্য পর্বতের রূপের রকমফের লক্ষ্য করা যায় বছরভর কিন্তু সবুজ সৌন্দর্যের বিস্ফোরণ হয় বর্ষাকালে। বৃষ্টিভেজা মাণ্ডুর যেন একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। এই সময় পাহাড়ী দুর্গ যেন প্রকৃতির নিজস্ব সাজে সেজে ওঠে। পাহাড়ের গায়ের গাছপালা সবুজ ও সজীব হয়ে ওঠে।

এছাড়াও আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কিছু সৌধ।

এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি ভারত সরকার ২০১৫ সালে পর্যটন শিল্পকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে ১৬টি রাজ্যের ২৫টি সৌধকে 'আদর্শ সৌধ' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আনন্দের বিষয় এর মধ্যে মাণ্ডুর ঐতিহাসিক সৌধগুলিও স্থান পেয়েছে।

অসামান্য স্থাপত্য, সৌধে সমৃদ্ধ এই দুর্গ একদিনে গড়ে ওঠেনি। দশম শতকে হিন্দুরাজা ভুজের (১০১০-১০৪২ খ্রিস্টাব্দ) হাতে মাণ্ডুর সূচনা হলেও বহু বছর ধরে হিন্দু ও মুসলমান রাজা-বাদশা ও সম্রাটদের সহায়তায় তিল তিল করে সেজে উঠেছিল এই দুর্গনগরী। তবে বর্তমানে দাঁড়িয়ে থাকা সিংহভাগ সৌধই তৈরি হয়েছিল ১৪০১ থেকে ১৫২৬ খ্রি.-এর মধ্যে। দিলওয়ার খানের পুত্র হোসাং ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় এসে ধার থেকে মাণ্ডুতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। নিজে পরিচিত হন সম্রাট হোসাং শাহ ঘোরি নামে। ১৪০৫ থেকে ১৪৩৫ খ্রি. এই শাসনকালে হোসাং শাহ তাঁর শিল্পপ্রতিভা ও শিল্প-পৃষ্ঠপোষকতার পরিচয় রেখে গেছেন। দুর্গে প্রবেশের জন্য ১২টি প্রবেশদ্বারের মধ্যে প্রধান প্রবেশদ্বার দিল্লি দরওয়াজা, জামি মসজিদ, হোসাং শাহের নিজের সমাধি তাঁরই আমলে তৈরি হয়।

মাণ্ডুর আকর্ষণ শুধুমাত্র ঐতিহাসিক সৌধেই সীমাবদ্ধ নয়। মাণ্ডু হল প্রকৃতি ও ইতিহাসের এক সংমিশ্রণ। একে যেন অন্যের পরিপূরক। একটিকে বাদ দিলে অন্যটিকে ঠিকমত অনুভব করা যাবে না। বিন্ধ্য পর্বতের রূপের রকমফের লক্ষ্য করা যায় বছরভর কিন্তু সবুজ সৌন্দর্যের বিস্ফোরণ হয় বর্ষাকালে। বৃষ্টিভেজা মাণ্ডুর যেন একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। এই সময় পাহাড়ী দুর্গ যেন প্রকৃতির নিজস্ব সাজে সেজে ওঠে। পাহাড়ের গায়ের গাছপালা সবুজ ও সজীব হয়ে ওঠে। ভেসে থাকা মেঘের তলায় পর্বতের গা রকমারি সবুজে ঢেকে যায়। তারই মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা বৃষ্টিধোয়া ঐতিহাসিক সৌধগুলি আরো ঝকঝকে হয়ে ওঠে। দুর্গম ও অজানা জায়গা থেকে নেমে আসা ঝর্নাগুলিও প্রাণ ফিরে পায়। তাদের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা জলের সুরেলা আওয়াজ যেন এখানকার অজানা ইতিহাসের কথা বলছে বলে মনে হয়। বৃষ্টিভেজা সবুজ প্রকৃতির পাশাপাশি ইতিহাসের সাক্ষ্য থাকতে অনেকেই বর্ষাতে এখানে আসেন। তবে শীতের মিঠে রোদে পিকনিকের মেজাজে মাণ্ডু ঘোরার আনন্দ ও মজা আবার অন্যরকম।

একটা পুরোদিনে মাণ্ডু ঘোরা হয়ে যায়। আমরাও মাণ্ডু দেখার জন্য পুরো একটা দিন হাতে পেয়েছিলাম। তবে শুধুমাত্র দেখা নয় মাণ্ডুকে অনুভব করতে লে একরাত থাকতেই হবে এখানে।

ভিলেজ অংশ

আলমগীর, দিল্লি ও ভাঙ্গি দরওয়াজা পার হয়ে আমাদের গাড়ি এসে থামল মাণ্ডুর বাজার এলাকায়। এই জায়গায় ভিলেজ বা সেন্ট্রাল অংশের সৌধগুলি আছে। প্রথমেই দেখলাম মামুদ শাহর তৈরি মার্বেল পাথরের আসরফি মহল। এরপর দেখে নিলাম জামি মসজিদ। এই মসজিদ দামেস্কের ওসাইয়েদ মস্ক-এর অনুকরণে তৈরি। বেলেপাথরে তৈরি এই মসজিদ আফগান শিল্পের নিদর্শন বহন করে চলেছে। তবে এর প্রবেশদ্বারের ডোমটায় হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন স্থাপত্য লক্ষ্য করা যায়। এই মসজিদের মাথায় ৫৮টি ছোট ও ৩টি বড় গম্বুজ শোভা পাচ্ছে। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে দর্শন করা যায় এই মসজিদ।

জামি মসজিদ দেখে আমরা চলে এলাম হোসাং শাহের সমাধিস্থলে। শ্বেতপাথরে তৈরি এই সৌধ হিন্দু মুসলিম ও আফগান শিল্পের মিশ্রণে নির্মিত। পাথরের জালির অসাধারণ কাজ আমাদের মন ভরিয়ে দিল। এই সৌধ দেখে মুগ্ধ শাহজাহান তাজমহল গড়ার আগে ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে ওস্তাদ হামিদসহ চারজন স্থপতিকে এখানে পাঠান। এখানকার দরজায় খোদিত এক লিপি থেকে এ তথ্য জানা যায়।

রেওয়াকুণ্ড গ্রুপ

ভিলেজ অংশের সৌধগুলি দেখে আমরা সোজা চলে এলাম ৫ কিমি দূরে রেওয়াকুণ্ডের সৌধ দেখতে। এখানে দেখবার মত জায়গা রেওয়াকুণ্ড, বাজবাহাদুর প্রাসাদ ও রূপমতী প্যাভিলিয়ন। ১৫৫৪ সালে বায়েজিদ খান মাণ্ডুর শাসনক্ষমতা দখল করেন ও নাম পরিবর্তন করে বাজবাহাদুর নামে পরিচিত হন। বাজবাহাদুর ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয়। রাজকার্যের থেকেও সঙ্গীত তার কাছে বেশি প্রিয় ছিল। মান সিং রাঠোরের কন্যা রূপমতী ছিলেন অসামান্য সুন্দরী ও সঙ্গীতজ্ঞ। হিন্দুকন্যা রূপমতীর রূপে ও সঙ্গীতের টানে বাজবাহাদুর তার প্রতি অনুরক্ত হন। নিমার উপত্যকায় বয়ে চলা নর্মদা নদী দর্শনের জন্য রূপমতী আসতেন। নর্মদাদর্শনের অঙ্গীকার পেয়ে রূপমতী বাজবাহাদুরের সঙ্গে মাণ্ডুতে চলে আসতে রাজি হয়ে যান। পারমার রাজারা পাহাড়ের ঢালে তৈরি করান রেওয়াকুণ্ড। পরবর্তীকালে বাজবাহাদুর এর সংস্কার করেন রূপমতীর জন্য। কুণ্ডের কাছেই ১৫০৮ সালে নাসিরুদ্দিন শাহর গড়া প্রাসাদ। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে তৈরি এ প্রাসাদ পরিচিত হয় বাজবাহাদুর প্রাসাদ হিসেবে। প্রাসাদের সঙ্গীত মহলে রূপমতী ও বাজবাহাদুরের গানের মজলিশ বসত। রেওয়াকুণ্ডের একটি দিক থেকে জলের জোগান দেওয়া হত প্রাসাদে। তখনকার সৌন্দর্য বাজবাহাদুর প্রাসাদে এখন না থাকলেও দেখতে দেখতে মন চলে যায় অতীতে। বাজবাহাদুর প্রাসাদ দেখে আমরা এগিয়ে চললাম রূপমতী প্যাভিলিয়নের দিকে। অনেক দূর থেকে আফগান স্থাপত্যে গড়া এই প্যাভিলিয়ন দেখতে পাওয়া যায়। রূপমতী প্রাসাদ থেকে এখানে আসতেন নর্মদা দর্শনের জন্য। রূপমতী প্যাভিলিয়নের উপর থেকে মাণ্ডুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। এখানে প্রবেশের জন্য টিকিট কাটতে হয়।

রূপমতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে মোঘল সম্রাট আকবর তাঁর সেনাপতি আদম খাঁকে মাণ্ডু আক্রমণ করতে পাঠান। বাজবাহাদুর পালিয়ে আত্মরক্ষা করলে মাণ্ডু মোঘলদের দখলে চলে আসে। উপায়ান্তর দেখে নিজের সম্মান বাঁচাতে রূপমতী বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

রেওয়াকুণ্ড অংশের সৌধগুলি দেখার পর আমরা দুপুরের খাবার সেরে কয়েকটি ছড়িয়ে থাকা সৌধ দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। এর মধ্যে নীলকণ্ঠ প্রাসাদের কথা আলাদা করে না বললেই নয়। ষোড়শ শতকে লাল পাথরে তৈরি এই প্রাসাদ। পাহাড়ী ঢালে তৈরি এই প্রাসাদ থেকে সামনের উপত্যকার নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। আকবরের দাক্ষিণাত্য বিজয় এখানকার দেওয়ালে লিপিবদ্ধ আছে। নীল গরল গলায় নেওয়া নীলকণ্ঠ শিবের মন্দির এখানে প্রতিষ্ঠিত। তাই প্রাসাদের নাম নীলকণ্ঠ প্রাসাদ।

রয়্যাল এনক্লেভ অংশ

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে হতে আমরা চলে এলাম রয়্যাল এনক্লেভ অংশের সৌধ দেখতে। এই অংশের সৌধগুলি হল দিলওয়ার খাঁ মসজিদ, হাতিপোল, নহর ঝরোকা, হিন্দোলা মহল, জাহাজ মহল, তাভেলি মহল। এই সৌধগুলি দেখবার জন্য প্রথমেই পাঁচ টাকার টিকিট কাটতে হল। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা অবধি প্রবেশের জন্য সময় দেওয়া আছে। বিশাল এক ফটক পার হয়ে তবেই মূল জায়গার দর্শন পাওয়া যায়। ফটক অতিক্রম করতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। সামনেই বাঁদিকে সুবিশাল জাহাজ আকৃতির প্রাসাদ যা 'শিপ প্যালেস' বা জাহাজ মহল নামে পরিচিত। মহলের দুইদিকে দুই বিশাল কৃত্রিম জলাশয় বা তালাও। একদিকে মুঞ্জ তালাও ও অপরদিকে কাপুর তালাও; মধ্যে সরু ও লম্বা একফালি জায়গায় প্রাসাদ। তালাওয়ের পাশে সুন্দর ফুলের বাগান। ডানদিকে তাভেলি মহল। 'তাভেলা' শব্দটির অর্থ 'আস্তাবল'। অর্থ থেকেই অনুমান করা যায় এই জায়গা আগে রাজা-মহারাজাদের ঘোড়া রাখবার জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হত। এখন অবশ্য এখানে খুব সুন্দর একটি মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে। তাভেলি মহলের অবস্থান এমনই যে এই মহলের ওপর থেকে জাহাজ মহলের সৌন্দর্য সবচেয়ে ভাল উপভোগ করা যায়। হয়তো সেই কথা ভেবেই বর্তমানে তাভেলি মহলের ওপর তলায় পর্যটকদের জন্য একটি রেস্ট হাউস তৈরি করা হয়েছে। জাহাজ মহল বাঁদিকে রেখে সোজা এগিয়ে বাঁদিকে বেলেপাথরের তৈরি 'হিন্দোলা মহল' বা 'দোদুল্যমান প্রাসাদ'। এটি একটি বৃহৎ মিটিং হল বা দরবার। হিন্দোলা মহলের ইংরেজি তর্জমা করলে দাঁড়ায় Swinging palace। এটি ইংরেজি "T" আকৃতির, এখানে একটি প্রধান হল আছে (৩০মি. x ১৮মি. x ১২মি.), এর পাশের দেওয়াল ৩মিটার চওড়া ও ৭৭ ডিগ্রি কোণে নত। যার জন্য মনে হয় যেন খানিকটা ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। হিন্দোলা মহলের জাফরির কাজ সত্যি মুগ্ধ করার মত।

হিন্দোলা মহলের পাশেই নহর ঝরোকা। মার্বেল দিয়ে নির্মিত। এই নহর ঝরোকা বা টাইগার ব্যালকনি থেকে সুলতান দর্শন দিতেন।

জাহাজ মহল ৪০০ফুট লম্বা, ৫০ফুট চওড়া ও ৩২ফুট উঁচু। প্রাসাদের নীচের তলায় তিনটি বিশাল হলঘর ও অনেকগুলি কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি কক্ষের সঙ্গে আছে একটি করে মণ্ডপ। প্রাসাদের বাইরে একটি সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা যায়। ঠিক যেমন আসল জাহাজে সিঁড়ি থাকে। মহলের উপর থেকে পাহাড়ঘেরা মাণ্ডুর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। প্রাসাদের মিনার, গম্বুজ, মণ্ডপ, সেই সময়কার বিলাসবহুল স্নানাগার– সবই দেখবার মত। একতলায় কূর্মাকার ও দোতলাতে পদ্মাকার সুইমিং পুল আজও সকলের নজর কাড়ে। জাহাজ মহলের নির্মাতা সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাণ্ডুতে রাজত্ব করেন ১৪৬৯ খ্রি. থেকে ১৫০০ খ্রি. পর্যন্ত। কথিত আছে আমোদপ্রিয় এই সুলতানের আমলে জাহাজ মহলের হারেমে ১৫হাজার সুন্দরী থাকতেন। ১৫৬১ খ্রি. থেকে ১৭৩২ খ্রি. অবধি মাণ্ডু ছিল মোঘল শাসনাধীনে। সেইসময় আকবর, জাহাঙ্গীর এখানে নানান স্থাপত্য নির্মাণ করান। সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে মাণ্ডু এতটাই প্রিয় ছিল যে উনি পত্নী নূরজাহানকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ ৭ মাস এখানে কাটান। জাহাজ মহলের সৌন্দর্য, সেই সময়কার আমোদপ্রমোদের বর্ণনা এবং তাঁর একান্ত অনুভূতি সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মকথায় যেভাবে দিয়েছেন, তারপরে আর নতুন করে জাহাজ মহলের বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। জাহাঙ্গীরের স্মৃতিচারণার ইংরেজি অনুবাদ থেকে জানা যায়: "It was a wonderful assembly. In the beginning of the evening they lighted lanterns and lamps all round the tanks and buildings and a lighting up was carried out the like of which has perhaps never been arranged in any place. The lanterns and lamps cast their reflection on the water and it appeared as if the whole surface of the tank was a plain of fire. A grand entertainment took place and the drunkard indulged themselves to excess."

আমরাও রয়েল অংশের সৌধগুলি দেখতে দেখতে বারবার হারিয়ে যাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন কোন অজানা টাইমমেশিনে চেপে সেই মোঘল আমলে উপস্থিত হয়েছি। এদিকে পশ্চিমের আকাশে সূর্য ঢলে পড়ছে। পশ্চিম আকাশের সোনালি রঙে জাহাজ মহল এক মায়াবী রূপ ধারণ করছে। মনে হচ্ছে সন্ধ্যে নামলেই হয়তো হাজার হাজার বাতি জ্বলে উঠবে।

প্র য়ো জ নী য় ত থ্য

কীভাবে যাবেন

হাওড়া-ইন্দোর শিপ্রা এক্সপ্রেস (২২৯১২) সোম, বৃহস্পতি ও শনিবার ১৭.৪৫-এ হাওড়া ছাড়ে। নামতে হবে ১৭৫৩ কিমি দূরের ইন্দোরে। সেখান থেকে মাণ্ডু সড়কপথে প্রায় ১০০কিমি।

কখন যাবেন

মাণ্ডু দেখার সেরা সময় জুলাই-আগস্ট এবং অক্টোবর থেকে মার্চ। শীতের রোদে দুর্গ দর্শন ভালই লাগবে।

কোথায় থাকবেন

মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের হোটেল-মালওয়া রিসর্ট, মালওয়া রিট্রিট। এছাড়া অন্যান্য হোটেলের মধ্যে হোটেল রূপমতী, মান্ডু-ইন ইত্যাদি। আরো বিশদে জানবার জন্য দেখতে পারেন মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের ওয়েবসাইট।

অমিতাভ ঘোষ
ভারতের ভ্রমণলেখক

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

নতুন গ্রাহক অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে

আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইতোমধ্যে ভারত বিচিত্রার অনলাইন এডিশনের সুবিধা চালু হয়ে গেছে এবং আপনারা অনলাইনে ভারত বিচিত্রা পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও ফেসবুকে সংযুক্ত হতে পারেন। এই মুহূর্তে পত্রিকাটির নতুন গ্রাহকদের নাম-ঠিকানা অন্তর্ভুক্তির কাজ চলছে। ভারত বিচিত্রার পুরনো ও নতুন গ্রাহক-পাঠকদের অনেকেরই টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর/ ই-মেইল আইডি আমাদের কাছে নেই। যাঁরা নিয়মিত ভারত বিচিত্রা পড়তে ইচ্ছুক, এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর অবিলম্বে নতুন গ্রাহক হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে নাম, পদমর্যাদা (যদি থাকে), পূর্ণ ঠিকানা, টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল আইডি (যদি থাকে) উল্লেখ করে সম্পাদক বরাবর চিঠি লিখে পাঠান। সবাইকে ভারত বিচিত্রার সঙ্গে সব সময় সংযুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই সংশোধিত নতুন তালিকা প্রস্তুতির এ আয়োজন।

ভারত বিচিত্রার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি, এর প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং একে আরও প্রাঞ্জল রূপ দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। আপনাদের প্রিয় পত্রিকায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার কপি রেখে এবং ঠিকানা নির্ভুলভাবে লিখে পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ৬ মাসের মধ্যে মুদ্রিত না হলে বুঝতে হবে লেখা অমনোনীত হয়েছে। এ ব্যাপারে যে কোন ধরনের যোগাযোগ লেখকের অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

– সম্পাদক

ছোটগল্প

মন্তাজ গায়েন

খায়রুল আলম সবুজ

মন্তাজ গায়েনের বোধ কেমন ঘোলা ঘোলা। আরসি লেমনের মত অথবা বলা যায় তালের তাড়ি যে রকম। তাকালে পরিষ্কার কিছু দেখা যায় না, অথচ দৃষ্টিশক্তি একটুও কমেনি। কিছু বোঝার চেষ্টা করলে সামান্য একটুও এগোতে পারে না। মাথাটা ঝিম মেরে থাকে, থম মেরে থাকে– খোলে না। মাথা খেলে না। পাঁচ দিন ধরে একমাত্র সন্তান ছেলে তার ঘরে আসে না। অথচ ঘরে না আসার কোন কারণ ঘটেনি। কী হতে পারে তা তার মাথায় খেলে না। ভাবতেও পারে না ছেলে না এলে তার কী হবে, ছেলের মা'র কী হবে। একটা ভ্যানগাড়ি নিয়ে সারা দিন এখানে-ওখানে ঘুরছে। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়েছে, কোথাও ছেলের সন্ধান মেলেনি।

আর কিছুক্ষণ পর দিগন্তে সূর্য নেমে গেলে মন্তাজ গায়েনের ভবিষ্যতের মত অন্ধকার নামবে চরাচর জুড়ে। রাতের অন্ধকার। সে রাত নামলেই যেন একটা ভয় তার শিরদাঁড়া বেয়ে ওঠানামা করে। কেন সে ভয়, কী কারণ, সে-সব মন্তাজ জানে না, বুঝতেও পারে না। তবু তার ভয় হয়। অন্ধকার রাতের চেহারাটাই যেন কেমন। দৃশ্যমান সবকিছু তলিয়ে যায়, অগোচরে চলে যায় জোয়ারের পানির মত, অন্ধকার কানাকাঞ্চি করে ফেলে। চেনা তালগাছটা, তেঁতুল গাছটা কেমন ভয় দেখায়, ঝাঁকড়া বুনো ঝোপ মনে হয় খুনির আশ্রয়। পাঁচ দিন ধরে কারণে-অকারণে কেঁপে উঠেছে মন্তাজ। হালদার বাড়ির দরজা ডাইনে ফেলে ক্লান্ত ভ্যানগাড়িটা কোনমতে এগিয়ে যায়। সামনের বাঁকটা ঘুরে বাড়ির পথ ধরে সে। গায়েনের ভেতরে একটা গান গুনগুন করে। বার বার আসে যায়। কোন একসময় মন্তাজ গায়েনের নামডাক ছিল খুব। বয়স হয়েছে, এখন আর গলা নেই, কিন্তু গান আসে, নতুন গান। কখনো বাঁধে, কখনো বাঁধে না। একটু এগিয়ে কাঞ্চন মৃধার বাঁশের ঝাড়। ঝাড়ের মাঝ বরাবর প্রশস্ত একটা পথ পড়েছে। ডাইনে-বাঁয়ে আর ওপরে বাঁশের কঞ্চিতে জড়াজড়ি। খররোদের দুপুরেও এখানে ঠাণ্ডা ছায়া থাকে। মন্তাজ তার ভ্যানগাড়িটা ঝাড়ের পাশে থামিয়ে নামল। বাড়িতে ঢোকার আগে একটু শক্তি সঞ্চয় করে নেয়া। আনুর মার চোখ দুটি তার মনে ভাসে। তার কোন জিজ্ঞাসার কোন উত্তর নিয়ে সে ঘরে ফিরছে না উত্তরহীন মানুষ ঘরে ফেরে কী করে? রাস্তার পাশে বাঁশ হেলান দিয়ে

বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। চিরল পাতার ফাঁকে ফাঁকে আকাশ ঝিলিক দেয়। মন্তাজ ওপরে তাকায় কেন তাও সে বোঝে না। চোখ দুটি বুজে ঝিম মেরে বসে থাকল খানিকটা সময়। গানটা আবার আসে– আবার। চোখ বুজেই গেয়ে ওঠে মন্তাজ।

সেই তারে
কেউ কি পারে এড়াইতে গো সেই তারে
তার সময়ই সময় তোমার
সেই ভরসায় দিন কর পার
তিনিই ডুবায় আবার
ভয়াল নদী পার করে– সেই তারে
কেউ কি পারে এড়াইতে গো– সেই তারে।

দুই.

মতলব তার দোকানে বসে চা বানাচ্ছে। চার-পাঁচজন লোক গল্প-গুজব করছে আর চা খাচ্ছে। মতলব নিজেও খায়– একটু পরপরই সে নিজের চা নিজেই খায়। মন্তাজের ভ্যানগাড়িটা দূর থেকেই সে আসতে দেখেছে। এমনিতেই মন্তাজ নিরিবিলি মানুষ। তার উপস্থিতি টের পাওয়া যায় না। আজ যেন আরো বেশি, দোকান থেকে কিছুটা দূরে ভ্যানগাড়ি থামাল সে। এদিকে না এসে ওখানেই বসে পড়ল। মানুষ থেকে দূরে– অযথা-অকারণ প্যাঁচাল শুধু যে ভাল লাগে না, তা নয়– অসহ্য ঠেকে। বাড়ি ঢোকার আগে কেন যেন ইচ্ছে হল এখানে বসার।

মতলবের সাতাশ-আটাশ বছর বয়স হবে। আনন্দ করেই সে দোকানটা চালায়। মন্তাজ গায়েনের গান সে ছোটবেলায় শুনেছে, সে-সব সুর তার এখনো মনে আছে। মন্তাজকে দেখেই মতলব দুধ বেশি দিয়ে এক গ্লাস চা তৈরি করতে লেগে গেল। চা বানাতে বানাতে প্রশ্নটা দূরে ছুড়ে দিল মন্তাজকে– কোন খবর পাইলা?

মন্তাজ প্রায় বিড়বিড় করে বলল, নারে, অহনতরি পাই নাই। পোলাপান মানুষ মনের মইধ্যে কত কথা অয়। আইব– যাইব কোই?

গ্লাসটা ওঠাতে ওঠাতে মতলব বলে– তোমার ভ্যান দেখার লগে লগে চা বানানো শ্যাষ। দূরে বইলা ক্যা, নেও ধর, চা-ডা খাও। মন্তাজ হাত বাড়ায় না। মতলবের দিকে তাকিয়ে বলে, দিস না বাপ। কামাই বাদা নাই। মন চায় না। মতলব গলাটা তুলে বলে, তোমারে আর কিছু জিগাইছি? চা বানাইছি খাবা। এই তল্লাটে তো বটেই, সাত গ্রাম ছাড়ালেও মন্তাজ গায়েনের নাম আছে। নিজ গেরামে তার খায়খাতির কম নাই। চেনা মানুষ এখনো তাকে সালাম দিয়ে কথা বলে। নিজে গান গেয়েছে যৌবন কালটা ভরে, দূরে দূরে বায়না নিয়ে চলে গেছে। কখনো মাস দুইমাস পর ফিরেছে ঘরে। বাবা-মা'হারা সেই প্রায় ছোটকাল থেকে। নিকটজনের টান না থাকলেও এই মতলবদের মত কিছু লোকের মন ভিজানো আন্তরিকতার জন্য জন্মের গ্রামটা তার নিজেরই থেকে গেছে। এর জন্য তার মন কাঁদে– বড় মায়া। মতলবের বাড়ানো হাতটার দিকে চেয়ে চোখটা ভিজে উঠল, বলল, দে তয় একটুখানি খাই। এক চুমুক।

– মন্তাজকা এই চায়ের দাম গান দিয়া চুকাবা।

– নারে বাবা, এহোন আর দোম পাই না।

– তোমার গান শুনছি হেই ছোটকালে। একবার দুইবার। তাও তো হে কতা ভুলি নাই।

– হরে বাবা, আমি সেই পুরানা দিনের মইধ্যেই অহনতরি আইটকা রইছি। মন্তাজ গ্লাসটা দুই হাতে ধরে ছোট ছোট চুমুকে চাটুকু শেষ করে। মনটা তার আজ বাইরেও যেতে চায় না, ঘরেও যেতে চায় না। যে ছেলে কোনদিন অপ্রয়োজনে বাইরেও যায় না, সে আজ পাঁচদিন ধরে ঘরে ফেরে না। চা শেষ করতে করতেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে মন্তাজের গোটা সত্তা ছুঁয়ে। গ্লাসটা ফিরিয়ে দিয়ে কাউকে কোনকিছু না বলে সে ভ্যানগাড়ি নিয়ে চলে যায়। বাড়ি ফিরবে না কি অন্য কোথাও, তাও সে জানে না।

তিন.

গত পাঁচদিন নজিরন ঠিকমত খায়নি। রেঁধেছে, মন্তাজকে খাইয়েছে, শুয়েছে কিন্তু ঘুমায়নি। ছোট ঘরটা এখন বিরান। তার আনোয়ার কোথায় আছে, কি করছে, থেকে থেকে এসব চিন্তা তার মাথার মধ্যে ঘুর ঘুর করছে। শেষ বেলায় ঘরের দাওয়ায় বসে নজিরন দেখল ভ্যানগাড়িটা আঙিনায় ঢুকছে, থামছে, ছোট একটা পুঁটলি নিয়ে মন্তাজ নিস্প্রাণ পায়ে ঘরে ঢুকে গেল। নজিরনের সারা শরীর যেন ভারী হয়ে গেছে। বসলে আর ওঠার ইচ্ছা হয় না। শরীর যেন চলে না। তবু সে উঠল।

–একলাই ফিরলা?

–রাখো এইগুলো। পোলাপান বড় অইলে বাপ-মা আস্তে আস্তে একলা অয়। মাইনসের ছোটকালই ভাল, হাত ধরার মানুষ পাওয়া যায়। নেও–

হাজার সংকটেও মানুষের জীবন চলে। জীবনের চাকা কিসের তৈরি কে জানে, চলতেই থাকে। থামে না। সংকট কাটলেও চলে, না কাটলেও চলে। কীভাবে কেমন করে জীবনের সময় উড়ে গেল মন্তাজ বোঝে না। মন্তাজ কেন– কেউই বোধহয় বোঝে না। এই তো সে দিন ঝকঝক করে ছবিগুলো– কিন্তু দিন গুনলে পঞ্চাশ ষাট বছর– বড় অদ্ভুত সময়ের এই দৌড়। চোখের পলকে শেষ। গানটা আবার গুনগুন করে ভেতরে, সেই তারে, কেউ কি এড়াতে পারে গো, সেই তারে।

রাত বাড়ে।

রাতের অন্ধকার আরো গাঢ় হয়। কিন্তু কেউ কোন খবর নিয়ে আসে না। ভাল-মন্দ কোন খবরই না। একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে– দু'জন মানুষের সংসারে তৃতীয়জন যখন এল তার আগে ও পরে মন্তাজ এবং নজিরন একজন আরেকজনের মধ্যে বিলীন হয়ে সময় কাটিয়েছে। একের ওপর আরেকজন নিবিড়ভাবে নির্ভর করেছে। দোতারার সুর না হলে যেমন সুর খোলে না, তেমনি নজিরন না হলে মন্তাজের জীবনের রং খোলে না। সুখ-দুঃখকে আমল দেয়নি কখনো। সুখেও আনন্দ, দুঃখেও আনন্দ; কারণ মন্তাজ গায়েন জানে সুখ-দুঃখ মিলেমিশে জীবন সম্পূর্ণ। যত কাজ তাদের দু'জনার, যত কথা তাদের দু'জনার। কথার খইও ফোটাতে পারে নজিরন! সামান্য সময়ের চইন নাই। গায়েন ঘরে ফিরলেই হাজার বাক্যবাণে জর্জরিত হতে হয়। কত স্বপ্ন তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে। জজ-ব্যারিস্টার বানাবার শখ তার নেই। ছেলেকে মানুষ করে তুলবে। জন্মালেই মানুষ মানুষ হয় না, তাকে মানুষ করে তুলতে হয়। নজিরনকে মন্তাজ এ কথা বুঝিয়েছে, নজিরন বুঝেছে। সে কারণেই তাদের আর কোন সন্তান নেই। একজনকেই গড়েপিটে মানুষ করবে। মধুসঞ্চয়ী মৌমাছির মত সব মধু পুত্র-চাকে রেখেছে। গায়েনের গলা যখন পড়ে এল, সে ঘরে ঢুকল। সময়ের আগেই।

তারপর কত যে কাজ সে করার চেষ্টা করেছে। কোনটাতেই স্থির হয়নি। আর কিছু তো সে পারেও না। শেষমেশ এই ভ্যানগাড়ি। মন চায় না কিন্তু জীবন তো থামে না। তবে সে তো একা না, ছোট জীবনের ছোট যুদ্ধে নজিরনও হাত লাগিয়েছে। ছেলেকে স্কুলে দেওয়া থেকে শুরু করে ভাল পাস করে কলেজে ওঠা পর্যন্ত সব কাজ দু'জনই মিলেমিশে করেছে। নজিরন স্বপ্ন কখনো নীরবে দেখেনি, সরবে তার স্বপ্ন মন্তাজের সঙ্গে ভাগ করেছে, এই পাঁচদিন আগে পর্যন্ত। যেদিন ছেলে ঘরে এল না সেদিন থেকে নজিরন চুপ হয়ে গেছে। আড়ালে আড়ালে কাঁদে, কথা বলে না। যত সব অপ্রয়োজনীয় প্রাণ ভরানো কথা তার বন্ধ হয়ে গেছে– প্রয়োজনে একটি-দুটি। ছোট ঘরটার মধ্যে নীরবতা থমথম করে। গায়েনের বুক ফাটে, মুখে সে কথা বলে না।

বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে খাবার দিয়েছে নজিরন। দরমার বেড়ায় ঝুলছে দোতারা। দোতারাটা এমনভাবে বাঁকা হয়ে আছে যেন মন্তাজ গায়েনকে সে দেখছে। তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। একটু হাত দিলেও তো হয়, গায়েন তাও করেনি বহু দিন। জীবনের কারণেই জীবন থেকে অনেক কিছু বাদ দিতে হয়। খেতে খেতেই গায়েন খেয়াল করল তার নজিরন কাঁদছে। সংসারের সব কাজ করে যাচ্ছে নীরবে– ফাঁকে ফাঁকে কাঁদছে।

– আচ্ছা! কানলে কি সমস্যার সমাধান অয়? খাও।

– কোন দিন তো এ রহম করে নাই।

– কোন দিন করে নাই বইলা এক দিন যে করবে না সেই কথা কি কওন যায়? খাও খাও।

এবার নীরব কান্না সরব হয়।

– খাওন ওডে না মুখে।

মন্তাজ হঠাৎই তার খাওয়া বন্ধ করে নজিরনের দিকে তাকায়। অসহায় মানুষের এর চেয়ে বেশি কিছু করার থাকে না। নজিরনের গলা

ভ্যানগাড়ি নিত্যদিন না চললে জীবন চালাতে সামান্য যে পয়সা লাগে তাও আর জোটে না। অনিচ্ছুক ক্লান্ত পা, কিন্তু উপায় নেই, প্যাডেলে পা রাখতেই হয়। আজ ছয়দিন পার হল ছেলের কোন খোঁজ নেই। তাজুকে সঙ্গে করে এখানে-ওখানে খোঁজ নিয়েছে মন্তাজ। সারা দিন খোঁজাখুঁজি করে সন্ধ্যার দিকে তাজু ঘরে ফিরে গেছে। কিন্তু মন্তাজ ফেরেনি।

বসে গেছে, বসা বসা কথাগুলো তাকে আরো অসহায় করে ফেলে।

– যেই পোলা আধবেলা ঘরের বাইরে রয় না, আজ পাঁচদিন তার কোন খবর নাই।

– দয়াল বড় কঠিন ঠাঁই। বিপদে ভাঙলে চলে? ধৈর্য ধর। এহোন তো সে আর ছোডো নাই। বড় হইছে মাশাল্লাহ। অত চিন্তা কর ক্যান– আসবে আসবে। বাইরে থেকে তাজু শেখ ডাক দেয়।

– ওস্তাদ– ওস্তাদ, ঘরে আছ?

– তাজু আইছে। ভাত আছে?

– আছে। তিনজনের লাইগা রানছি না?

মন্তাজ গলা উঁচিয়ে বলে, আয়-আয় তাজু। নজিরন উঠে ঘরের ভেতরে চলে যায়। তাজু শেখ মন্তাজের গায়েনজীবনের সাগরেদ। কত দিন যে একত্রে কেটেছে তার হিসাব নেই। সুখ-দুঃখে কাছে থাকার মানুষ তাজু শেখ। সে এসে মন্তাজের প্রায় গা ঘেঁষে বসল।

– আয়, খাইতে বয়।

– না না অহন আর খামু না। বাড়ির দিক মুখ করছিলাম। মতলব কইল আনু নাকি আজ কয়দিন বাড়ি ফেরে নাই। শুইনা এ দিকে আইলাম। কই গেছে কও দেহি।

– কেমনে কমু। কাউরে তো কিছু কইয়া যায় নাই। আঠারো-উনিশ বছরে একবেলা বাইরে থাকে নাই যে পোলা– আইজ পাঁচদিন সে বাড়ি ফেরে না। কী করি কও দেহি। ওর মায়েরে তো আর রাহা যায় না। তোরা তো জানোস, সিদাসাদা মানুষ আমি– জীবনে ঘোরপ্যাঁচ বুজি নাই। কী বিপদে পড়লাম ক' দেহি। এ অবস্থায় কী করা লাগে তাও তো বুজি না।

– যাইতে পারে কোথায়?

– তিন কুলে আমার কেডা আছে যে তার কাছে যাইবে। যাওয়ার জায়গা তো দেহি না।

– তাহলে তো চিন্তারই কথা। কোন কারণে মন-টন খারাপ হয় নাই তো।

– না মন খারাপ হওয়ার তো কারণ নাই। এ ছেলে তো কলেজে পড়ে। বড় অইছে, কত পোলাপান কত রহম চলে। আনু তো হে রকম পোলা না। পয়সাপাতি যোগাইয়া এই কয় দিন আগে ওই জিনস না কী কয় হেই কাপুড়ের একটা প্যান্ট আইনা দিছি, শার্ট বানাইয়া দিছি। পোলাপান মানুষ, দিনের লগেও তো মিলা চলতে অয়। তয় আজ-কাইল একটা কথা খুব কয়। ভ্যান চালাইতে আমার খুব কষ্ট অয় হেইডা বোজে। আমারে কয় দোতারা বাইতে, হে আমারে কামাই কইরা খাওয়াইব।

কেঁদে ফেলে মন্তাজ গায়েন।

– পোলা আমার বাপ-মায়ের কষ্ট সহ্য করতে পারে না। শব্দ পেয়ে নজিরন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মন্তাজ নিজেকে সামলে নেয়। কেউই কোন কথা বলে না।

– তাজুভাই দুইডা ভাত খাও।

– না না ভাবি, এখন এক্কেরে বাড়ি গিয়াই খামু। এহন উডি। বিকেলে আইসা একটা চিন্তাভাবনা করমুনে, কী করা যায়।

তাজু চলে গেলে দু'জন মানুষ চুপচাপ বসে থাকে। কারো মুখেই আর খাবার ওঠে না। জগৎসংসারে ছোট একটা ঘরে কোথায় তার কী হয় সে খবর কি কেউ রাখে?

চার.

ভ্যানগাড়ি নিত্যদিন না চললে জীবন চালাতে সামান্য যে পয়সা লাগে তাও আর জোটে না। অনিচ্ছুক ক্লান্ত পা, কিন্তু উপায় নেই, প্যাডেলে পা রাখতেই হয়। আজ ছয়দিন পার হল ছেলের কোন খোঁজ নেই। তাজুকে সঙ্গে করে এখানে-ওখানে খোঁজ নিয়েছে মন্তাজ। সারাদিন খোঁজাখুঁজি করে সন্ধ্যার দিকে তাজু ঘরে ফিরে গেছে। কিন্তু মন্তাজ ফেরেনি। মাইল তিনেক দূরে শহরের প্রায় কাছাকাছি তার দূর-সম্পর্কের এক ভাই থাকে। ভাবল তার সঙ্গে একটু পরামর্শ করলে হয়। একটা কিছু তো করতে হবে। তারপর সেই ভাইকে নিয়ে থানায় একটা জিডি করিয়ে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। যদিও তার সঙ্গে হারাবার মত কিছু নেই তবুও মরা চাঁদের রাতে এই বিজন পথে তার ভয় হয়। ইটের রাস্তা। ভ্যান চলার খরখর শব্দ হয়। শব্দটাও যেন কেমন রহস্য করে। হাতের বাঁয়ে যত দূর চোখ যায় ধানজমি– ডানদিকেও কিছু দূর জমাজমি বাড়িঘর, তার ওপাশে নদী। গাছপালা ঝোপঝাঁড়ের ফাঁক-ফোকর দিয়ে মরা চাঁদের জ্যোৎস্নামাখা নদীটার আভাস পাওয়া যায়। একা পথে চলতে চলতে মন্তাজ গায়েনের সেই গানটা আবার মনে আসে–

সেই তারে
কেউ কি পারে এড়াইতে গো সেই তারে।

মন ভাল নেই। পথেঘাটে সন্তান খুঁজতে গিয়ে এ কদিন কাজটাজও তেমন হয়নি। হাতে কানাকড়িও নেই; চুলোয় হাঁড়ি চড়ে কি চড়ে না, তারপরও মনের মধ্যে গান গুনগুন করে। কী আশ্চর্য! আসে কোত্থেকে! গাড়ি চালাতে চালাতে গানের মধ্যে ঢুকে যায় মন্তাজ গায়েন। হঠাৎ কেউ একজন ডেকে ওঠে

– কই যাবে ভ্যানগাড়ি?

এগিয়ে কাছে এসে উত্তর দেয় মন্তাজ

– বিষখালি বাজারে।

তিনটি ছেলে দাঁড়িয়ে একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। খাটোপনা চ্যাপটা ধরনের ছেলে একটু সামনে এসে বলল,

– নদীর পার শ্মাশানঘাটে আমাগো একটু নামাইয়া দেবেন।

অন্যজন বলে, পাঁচশো।

অন্তরের কোন কুঠুরি সাড়া দিল মন্তাজ জানে না– বলল, ওঠো বাবারা। ছেলে তিনটি উঠে বসল। তাদের সঙ্গে মাল বলতে মুখবন্ধ একটি বস্তা। নদীর প্রায় গা ঘেঁসে গাড়িটা থামল। মাইলখানেক আসতে না আসতেই গায়েন হাঁপিয়ে উঠেছে। বুকটা ধড়াম ধড়াম করে। ওরা তিনজন ধরাধরি করে বস্তাটা নামাল। একজন মোটা মানিব্যাগ বের করে পাঁচটি একশো টাকার নোট দিয়ে বলল, যান।

মন্তাজ গাড়ি টেনে কিছুটা দূরে এসে টাকাটা গুনে দেখল– একশো টাকার কড়কড়া পাঁচটা নোট। স্বর্গ থেকে মরা চাঁদের আলো আসে মর্তে– সেই আলোতে বহমান রূপালি নদী দেখা যায়– দেখা যায় তিনটি মানুষের আকার ও একটি বস্তা।

সেই বস্তার ভেতর থেকে জিনসের প্যান্ট পরা একটা পা যে বেরিয়ে আছে সেটা কিন্তু কেউ দেখেনি।

খায়রুল আলম সবুজ কথাকার, অভিনয়শিল্পী

নলিনীকান্ত ভট্টশালী ইতিহাসের মানুষ

গোলাম আশরাফ খান উজ্জ্বল

পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা শুধু দেশ ও জাতির জন্য কাজ করেন– জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করেন জাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্য। তাঁদেরই একজন ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী। এই মানুষটি জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করে গড়ে তোলেন ঢাকা জাদুঘর। ঢাকা জাদুঘরই আজ বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর। নলিনীকান্ত ১৮৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলার নয়ানন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রোহিনীকান্ত, মাতা শরৎকামিনী। নলিনীকান্তের পৈতৃক বাড়ি একই উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামে। বাবা ছিলেন পোস্টমাস্টার। ছোটবেলায় কাকা অক্ষয়চন্দ্রের যত্নে লালিত-পালিত হন। কাকা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। পাইকপাড়া পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর নলিনীকান্ত ১৯৫০ সালে সোনারগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রাস পাশ করেন পাঁচটাকা বৃত্তি ও রৌপ্য পদকসহ। ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। পরবর্তী পড়াশোনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯১২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাশ করেন।

কর্মজীবনের এক পর্যায়ে নলিনীকান্ত বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য একটি সংগ্রহশালা নির্মাণের প্রচেষ্টা করেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৯১২ সালে ঢাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রথম সম্মেলন হয়। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯১৩ সালের ৭ জুলাই এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এ সময় ঢাকা জাদুঘরের অবৈতনিক সম্পাদক হিসেবে কাজ করছিলেন এইচ ই স্টেপলটন। দায়িত্ব পালনে তিনি অপারগতা প্রকাশ করলে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে মাসিক একশো টাকা বেতনে জাদুঘরের দায়িত্ব গ্রহণে নলিনীকান্তকে অনুরোধ করেন। নলিনীকান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

এরপর তিনি নিজের মনের মত করে জাদুঘরকে সাজাতে থাকেন। তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের পর পাইকপাড়ার জগদীশকুমার মজুমদার ও বজ্রযোগিনীর রায়বাহাদুর রমেশচন্দ্র গুহ ৮টি মূর্তি নিয়ে আসেন জাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য। জাদুঘরকে সাজাতে তিনি জীবনের তেত্রিশটি বছর ব্যয় করেন। বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অমূল্য প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ করেন– সংগ্রহ করেন বিভিন্ন মূর্তি, শিলালিপি, তাম্রশাসন, পটচিত্র, পোড়ামাটির ফলক। ১৯১১ সালে কুমিল্লার এগার মাইল পশ্চিমে ভারেল্লা গ্রামে প্রাপ্ত নটরাজ মূর্তি পেয়ে তার পাঠোদ্ধার করেন নলিনীকান্ত। এটিই তাঁর জীবনের প্রথম পাঠোদ্ধার– প্রবন্ধটির নাম A Forgotten Kingdom of Eastern Bangal। ১৯১২ সালে ড. নালিনীকান্ত নরসিংদীর বেলাব গ্রামে প্রাপ্ত বিক্রমপুরের ভোজ বর্মদেবের একটি তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করেন। আরবি শিলালিপির পাঠোদ্ধারের জন্য ১৯১৮ সালে তিনি আরবি শিখতে শুরু করেন। তিনি সুলতানী আমলের বহু মুদ্রালিপি আরবি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁর গবেষণামূলক বইগুলো হল *কয়েনস এন্ড ক্রোনোলজি অফ দি আর্লি ইন্ডেপেন্ডেন্ট সুলতানস অফ বেঙ্গল*। গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রিফিত' পুরস্কার লাভ করে। এটি ১৯১২ সালের কথা। তাঁর আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ *আইকোনোগ্রাফি অফ বুডিস্ট এন্ড ব্রাহমিনিক্যাল স্কালপচার ইন দি ঢাকা মিউজিয়াম*। এই গ্রন্থটির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। নলিনীকান্ত অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে *বীর সিংহ, হাসি ও অশ্রু, গোপিচাঁদ সন্ন্যাস, প্রবেশিকা ভারত ইতিকথা, প্রাথমিক ইংল্যান্ডের ইতিহাস* এবং *মুখ শতক* উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসের এ মানুষটি তথ্যের জন্য মুন্সীগঞ্জ, কোটালীপাড়া, কুমিল্লা, সোনারগাঁও, বরেন্দ্র, খুলনা, যশোর, দিনাজপুর, মালদহসহ বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছেন। ১৯৪৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা জাদুঘরের বাণীকুটিরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বাংলার ইতিহাসে তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

গোলাম আশরাফ খান উজ্জ্বল
সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

উপরে ॥ ১. ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরে ঋত্বিক ঘটক রেট্রোসপেক্টিভ উদ্বোধন ২. ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ আইজিসিসি গুলশান কেন্দ্রে ভারতের পণ্ডিত সারথি চট্টোপাধ্যায়ের হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত পরিবেশন ৩. ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বসুন্ধরার আইইউবি মিলনায়তনে অর্ণ কমলিকার *শ্যামা* নৃত্যনাট্য পরিবেশন

নিচে ॥ ৪. ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ আইজিসিসি গুলশান কেন্দ্রে রওশন আরা সোমা ও রাহাত আরা গীতির নজরুল, লোকসংগীত ও আধুনিক বাংলা গান পরিবেশন ৫. ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ আইজিসিসি গুলশান কেন্দ্রে এবাদুল হক সৈকতের সেতারবাদন ৬. ১১ মার্চ ২০১৬ জাতীয় জাদুঘরে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra March 2016

সত্যমেব জয়তে

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

নতুন আইভিএসি কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার স্বীকৃত এজেন্ট এস্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা দিচ্ছে যে, এখন থেকে ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য ঢাকার উত্তরাসহ বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুরে নতুন আইভিএসি খোলা হয়েছে।

কার্যক্রমকাল

রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র গ্রহণ সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা।
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র বিতরণ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা।

ঠিকানা

আইভিএসি-র সব কেন্দ্রে সব ধরনের ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন নিম্নোক্ত আইভিএসি কেন্দ্রে বিদ্যমান। এগুলো হচ্ছে: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা ॥ আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা ॥ আইভিএসি, ধানমন্ডি, ঢাকা ॥ আইভিএসি, উত্তরা, ঢাকা ॥ আইভিএসি, চট্টগ্রাম ॥ আইভিএসি, সিলেট ॥ আইভিএসি, খুলনা ॥ আইভিএসি, রাজশাহী ॥ আইভিএসি, বরিশাল নর্থ সিটি সুপার মার্কেট দ্বিতীয় তলা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, অমৃতলাল দে রোড, বরিশাল (এলাকা: বরিশাল, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর) ॥ আইভিএসি, ময়মনসিংহ, ২৯৭/১ মাসকান্দা দ্বিতীয় তলা, মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড, ময়মনসিংহ (এলাকা: জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, টাঙ্গাইল ও ভালুকা) ॥ আইভিএসি, রংপুর, জে বি সেন রোড, রামকৃষ্ণ মিশনের বিপরীতে, মহিগঞ্জ, রংপুর (এলাকা: রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এবং লালমনিরহাট)। উল্লেখ্য, ঢাকার বাইরের এলাকার ভিসা আবেদন ঢাকার কোন কেন্দ্রে গ্রহণ করা হবে না।

ভিসা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের সঠিক বিভাগ নির্ধারণ করে আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব দলিল সঠিক, সম্পূর্ণ ও অবিকল হওয়া চাই। আবেদনকারীদের এজেন্ট ও মধ্যবর্তী মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং এসব ক্ষেত্রে নিকটতম থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইভিএসি বাংলাদেশে তার পক্ষে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে অনুমোদন দেয়নি।

পুনর্নির্ধারিত প্রক্রিয়া ফি

১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে পুনর্নির্ধারিত ভিসা প্রক্রিয়া ফি নিম্নোক্ত হারে কার্যকর হবে: ১. ঢাকার সব আইভিএসি কেন্দ্র– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০। ২. আইভিএসি, চট্টগ্রাম– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রাজশাহী– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৪. আইভিএসি, সিলেট– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৫. আইভিএসি, খুলনা– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৬. আইভিএসি, বরিশাল– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ৭. আইভিএসি, ময়মনসিংহ– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রংপুর– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০।

আলোকচিত্র আপলোডের নতুন পদ্ধতি:

আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদনপত্রে দেওয়া নির্ধারিত জায়গায় তাদের আলোকচিত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্ক্যানকৃত আলোকচিত্র ছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

হেল্পলাইনসমূহ

হেল্পলাইন টেলিফোন/ফ্যাক্স/ ই-মেইলসমূহ: ০০-৮৮-০২ ৮৮৩৩৬৩২২ ॥ ০০-৮৮-০২ ৯৮৯৩০০৬ ॥ ০০-৮৮-০১৭১৩ ৩৮৯৪৯৯ ০০-৮৮-০২ ৯৮৬৩২২৯ (ফ্যাক্স) ॥ visahelp@ivacbd.com. আরো সাহায্যের জন্য ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in
ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে-কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে ভিজিট করুন: http://www.ivacbd.com/faq.php

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত